চিত্রাবলি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

সূচী।

—o:: § ::o—

Printed and Published
By
DHIRENDRANATH LAHIRI,
at the
"Prithibir Itihasha" Printing Works,
2, Annoda Prosad Banerji's Lane, Khirertola,
Howrah. *(Calcutta).*

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

সূচনা।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত অনেক গল্প ও উপন্যাস নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। সে গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এই 'চিত্রাবলি' গ্রন্থে তাহারই কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্প বা উপন্যাস মাত্র স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইলে, ভবিষ্যতে এইরূপ অপরাপরগুলিও প্রকাশের চেষ্টা পাইব।

'চিত্রাবলি'—সমাজ-চিত্র। কি সূত্রে কি কাল-কীট প্রবেশ করিয়া সমাজ-শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে, 'চিত্রাবলির' চিত্র-পঞ্চকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। তাহাতে নিদান-জ্ঞানে উপযুক্ত ভেষজের ব্যবস্থায় অনেকেরই প্রবৃত্তি আসিতে পারে।

এই 'চিত্রাবলির' একটী চিত্রে অশেষ-মাননীয়া বিদ্বজ্জনবরণীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার অতুলনীয়া তুলিকার সাহায্য পাইয়া আমরা পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। ১২৯৮ সালের 'ভারতী'তে (পরিশেষে 'নবকাহিনী'তে) "কেন" শীর্ষক তাঁহার একটী প্রাণস্পর্শী প্রশ্ন-গল্প প্রকাশিত হয়। ঐ সময়েরই 'অনুসন্ধানে' তাহার উত্তর মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই উত্তরটি এই গ্রন্থে প্রকাশের জন্য মূল গল্পটিও প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করি। তজ্জন্য আমরা অনুমতি-প্রার্থী হইয়াছিলাম। আপনার স্বভাবসঙ্গত সহৃদয়তা-বশে তিনি আমাদিগকে সে অনুমতি প্রদান করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"সাহিত্য-সংবাদ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্ন্যাল মহাশয় এই 'চিত্রাবলি' প্রকাশে ও সম্পাদনে বিশেষ সহায় ছিলেন। সুতরাং, এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম অবিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক। ইতি—

প্রকাশক।

চিত্রাবলি।

—— * ——

বিয়ে-বাড়ী।

—— * ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুবালার বিয়ে। হরিপুর গ্রামখানি আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কত জনের কত আনন্দ! বালকের দল, প্রতি-দিন সুবালাকে দেখিয়াছে, প্রতিদিন তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে; কিন্তু আজ তাহাদের সুবালাকে দেখিতে যাইবার জন্য অভিনব কৌতূহল! কোনও বালক, জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিতেছে,—'মা আমায় রাঙা কাপড়খানা পরিয়ে দে। আমি বৌ দেখ্‌তে যাব।' কোনও বালক, নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, বৌ দেখিতে গিয়া একবার উঁকি মারিয়া আসিতেছে, একবার বা দিদিমাকে বৌ দেখাইয়া আনিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে। যাহারা সুবালার সমবয়সী, তাহারাও বর দেখিবার বৌ দেখিবার কত

জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। কোনও বালিকা, বরকে ঠকাইবার জন্য নানাবিধ কূট-প্রশ্ন শিক্ষা করিতেছে। কোনও বালিকা, বরের সহিত কিরূপ রসালাপ করিবে ভাঁজিয়া লইতেছে। শ্রীমতী বিনোদিনী সুকণ্ঠী বলিয়া গরবিনী। তিনি একান্তে বসিয়া গুণগুণ স্বরে গলা সানাইয়া লইতেছেন—"বঁধু হে, মনে পড়ে নাকি সে সুখ-স্বপন।"—আর ভাবিতেছেন, তিনি যখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঐ গানে তান ধরিবেন, তখন বরের মাথা ঘুরিয়া যাইবে,—তাঁহারই জয়জয়কার পড়িবে। ঠান্‌দিদি আসিয়া, বরকে ভেড়া বানাইবার মন্ত্রটা সুবালাকে বেশ করিয়া শিখাইয়া দিতেছেন। ঘোষ-গিন্নী, বাসর-ঘরের দ্বারদেশের একপার্শ্বে শিলখানা আর অপর পার্শ্বে এক গাছা ঝাঁটা রাখিয়া, হরিদ্রা-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিতেছেন। বর যখন বাসর-ঘরে প্রবেশ করিবে, 'ষষ্ঠী দেবতাকে ও চণ্ডী দেবতাকে প্রণাম কর' বলিয়া, ঝাঁটা-গাছটাকে ও শিলখানাকে প্রণাম করাইবেন,—এই আহ্লাদেই তিনি মনে মনে মস্‌গুল হইয়া আছেন।

সানাইয়ে সুর ধরিয়াছে—পুঁ-উ-উ! নহবতে বাজিতেছে—ডামাডুম্—ডামাডুম্—ডামাডুম্! সুরে সুর মিলিয়াছে—বালক-দলের কাহারও ক্রন্দন, কাহারও চীৎকার! পুরুষ প্রকৃতি—ভাবে ডগমগ সকলেই।

প্রায় মহাশয়ের কে কন্যা। সুতরাং অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না

হইলেও, তিনি সুবালার বিবাহে ব্যয়-বাহুল্যের ত্রুটি করেন নাই। দূর-দূরান্তর হইতে আত্মীয়-কুটুম্বগণকে আনাইয়াছেন, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়াছেন। গ্রামে কাহারও বাড়ী আজ আর হাঁড়ি চড়াইবার আবশ্যক হয় নাই। রায় মহাশয়ের বাড়ীই আজ সকলের আপনার বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে।

বিবাহের দুইটী লগ্ন আছে। সন্ধ্যা সাতটায় এবং রাত্রি দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটের পর সুতহিবুকযোগ ঘটিয়াছে। রায় মহাশয়ের ইচ্ছা—প্রথম লগ্নেই বিবাহ হয়। সেইরূপই আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে। বরের বিছানা, ছাঁদলাতলা, সম্প্রদান-ক্ষেত্র—কোথাও কোনও উপকরণের ত্রুটি নাই। বাসর-ঘর, বেলা হইতেই সজ্জিত হইয়াছে। বাসর জাগিবার জন্য পাড়া-পড়শীরা আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন। যাঁহার যেমন বসন-অলঙ্কার আছে, বাসর-বিলাসিনী রমণীরা বাসর জাগিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তৎসমুদায় পরিধান করিয়া আছেন। যাঁহার কবরীর উপর সিঁথিকাঁটা বিলম্বিত, তাঁহার মাথার কাপড়টা প্রায়ই যেন বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। যিনি অনন্ত-বালা পরিয়াছেন, তাঁহার হস্তাবরণ বস্ত্রাঞ্চল যেন স্খলিত হইয়াই আছে। বিবাহ-বাসরে বাহাদুরী লইবার জন্য বিলাসিনীগণের কতই বাহার!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয় একবার অন্দরে প্রবেশ করিতেছেন, একবার বাহিরে আসিতেছেন, একবার বা পথপানে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন।

শচীন্দ্রকে আনিতে যাইবার সময় হরিচরণ পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন,—বেলা দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিবেন। দশটা এগারটার সময় যখন তাঁহারা আসিলেন না, রায় মহাশয় মনকে প্রবোধ দিলেন,—"ভোরের ট্রেণটা তারা ধরতে পারে-নি। পরের ট্রেণে এলে, পাঁচটার মধ্যে নিশ্চয় এসে পড়্‌বে।"

পাঁচটা বাজিল। হরিচরণ বিষণ্ণ-বদনে ফিরিয়া আসিলেন। রায় মহাশয়ের তখনও বিশ্বাস হইল না যে, শচীন্দ্র আসে নাই। রায় মহাশয় কহিলেন,—"বরের সঙ্গে সঙ্গে না এসে তুমি একলা এলে যে? পাল্‌কী ও বাজনা নিয়ে রামদাস সারা দিন নদীর ধারে তোমাদের বাড়ীর ঘাটের নিকট অপেক্ষা

করছে। তোমরা এসে পৌঁছালে, বাদ্যবাজনা করে বরকে আনা হবে। তুমি কি তবে আগে পৌঁছান-সংবাদ দিতে এলে? এখানে সব প্রস্তুত থাকবে, সে কথা তো তোমায় আগেই বলে দিয়েছি! তবে তুমি একলা এলে কেন? বর কত দূরে?”

হরিচরণ উত্তর দিতে পারিলেন না, অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রায় মহাশয়ের ব্যাকুলতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হরিচরণ! ভাই, নীরব রইলে কেন? তবে কি কোনও বিঘ্ন ঘটেছে? শচীন্দ্র আমার ভাল আছে তো?”

হরিচরণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। রায় মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—“দাদা! আমি “এ মুখ আপনাকে আর দেখাব না মনে করেছিলাম। গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার শ্রেয়ঃ ছিল। আমি কোন্ মুখে আপনার সম্মুখে আবার উপস্থিত হ’লাম!”

রায় মহাশয়, ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া, অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন,—“কেন ভাই! কি হয়েছে? এমন কথা কচ্ছ কেন? কি হয়েছে, আমায় খুলে বল। শচীন্দ্রের শরীর ভাল আছে তো? সে কি তবে আসে-নি? বল, বল, সত্য বল,—আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।”

হরিচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—“দাদা! সর্ব্বনাশ

হয়েছে। শচীন্দ্র আর আমার নেই; আমার পক্ষে শচীন্দ্র আজ মরেছে।"

রায় মহাশয়।—"অমন অমঙ্গলের কথা বল কেন? পিতা হ'য়ে পুত্রের অশুভ কামনা কর্‌তে আছে কি?"

হরিচরণ।—"শচীন্দ্র আমার পুত্র নয়—সে আমার পরম শত্রু। তার মরণই আমার এখন মঙ্গল।"

রায় মহাশয়।—"ছি ছি! ও সব কথা মুখে আন্‌তে নেই! কেন? হয়েছে কি? আমায় খোলসা করে বল। আমি যে তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি। তার লেখাপড়ার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ব্যয় করেছি। আমার ক্ষুদকুঁড়া আর যা কিছু আছে, সকলই যে তার! সে কি আমার নিকট কখনও কোনও জিনিস চেয়ে পায়-নি ব'লে ক্ষুব্ধ হয়েছে? আমার তো স্মরণ হয় না,—তার কোনও অভাব কখনও আমি অপূর্ণ রেখেছি! যদি কিছু থাকে, যদি সে আভাব কিছু পেয়ে থাক, আমায় নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পার।—আমি প্রাণ দিয়েও তার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌বো। সে ঘড়ি-চেন চেয়েছিল; আমি বিয়ের আগেই তার পছন্দ-মত ঘড়ি-চেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে পোষাকের জন্য আব্‌দার করেছিল; আমি নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সাহেব-বাড়ী থেকে দু'শো টাকা খরচ করে তার পোষাক তৈরী করে দিয়েছি। ঘুণাক্ষরে তার অভাবের কথা শুন্‌লে, আমি কখনও তো তার অভাব অপূর্ণ রাখি-নি!"

হরিচরণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরে করাঘাত করিলেন; কহিলেন,—"হা হতভাগ্য! তোর পোড়া-অদৃষ্টে এ সুখ-সৌভাগ্য সম্ভব কি? যিনি পুত্রের অধিক যত্নে তোরে প্রতিপালন কর্‌লেন, তাঁরই বক্ষে তুই এই ভীষণ শক্তিশেল হান্‌লি!"

রায় মহাশয়ের এখনও যেন বিশ্বাস হইল না—শচীন্দ্র আসে নাই। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন,—"সে যা চায়, আমি তাই দেব। তুমি শীঘ্র তাকে নিয়ে এস। চল—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

হরিচরণ উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবলই শিরে করাঘাত করিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে পাল্‌কী-বেহারা সঙ্গে লইয়া রামদাস ফিরিয়া আসিল। রামদাস—রায় মহাশয়ের বাটীর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সম্মুখে হরিচরণকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, রামদাসের নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল।

রামদাস রোষকষায়িত লোচনে হরিচরণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"বিটলে বামুন! তুই যে সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তোকে কেটে ফেল্লেও সে রাগ যায় না।"

হরিচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—"রামদাস! তাই কর!—আমায় এখনি কেটে ফেল! আমার নিকট সে যন্ত্রণা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ।"

রামদাস রোষভরে দুই চারিটা গালিগালাজ দিতেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু রায়-মহাশয় তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন ;— বুঝাইলেন,—'হরিচরণ নিরীহ নির্দ্দোষ। হরিচরণকে তিরস্কার করার কোনই কারণ নাই। শচীন্দ্র না আসায় আমার অপেক্ষাও হরিচরণ মুহ্যমান হইয়াছে।'

রায়-মহাশয় সাদর-সম্ভাষণে হরিচরণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাই! আমি বুঝেছি। সকলই অদৃষ্টের লিখন। তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি পিতা হয়েও পুত্রকে আন্‌তে পার-নি, এতে তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি। এখন, এস ভাই, কিসে দায় উদ্ধার হই, তার উপায় কল্পনা করি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শচীন্দ্রের বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর উত্তীর্ণ-প্রায়। এবার শচীন্দ্র বি-এ পরীক্ষা দিবে। কলেজে প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া সে পরিচিত। সচ্চরিত্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়াও তাহার খ্যাতি আছে। শচীন্দ্রের এ সকল গুণের কথা শুনিয়া, পিতার কত আনন্দ! তাঁহার প্রাণভরা আশা,—শচীন্দ্র মানুষ হইলে সংসারের সকল দুঃখের অবসান হইবে!

হরিচরণ চিরদরিদ্র। অতি-কষ্টে তাঁহাকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। রায়-মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাল্য-প্রণয়। রায়-মহাশয় তাঁহাকে কনিষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান করেন। হরিচরণের পুত্র শচীন্দ্র অর্থাভাবে লেখাপড়া শিখিতে পাইতেছে না,—এ সংবাদ যেদিন তিনি জানিতে পারেন, সেইদিন হইতেই তিনি শচীন্দ্রের লেখাপড়ার সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য বলিতে পারা যায় না। তাঁহার মনে মনে ছিল,

—শচীন্দ্রের সহিত তিনি সুবালার বিবাহ দিবেন। কতকটা সে কারণেও বটে, কতকটা সৎ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াও বটে, তিনি বাল্যাবধি শচীন্দ্রের লেখাপড়ার সর্ব্ববিধ ব্যয়-ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন। যে অর্থ শচীন্দ্রের জন্য তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল, সে অর্থে তিনি অনেক যোত্রবান পাশ-করা পাত্রও পাইতে পারিতেন। কিন্তু, কতকটা হরিচরণের আনুগত্য-হেতু, কতকটা বা শচীন্দ্রের প্রতি স্নেহবশতঃ, তিনি শচীন্দ্রের সম্বন্ধে ব্যয়-বাহুল্যে কখনই ত্রুটি করেন নাই।

সেই শচীন্দ্র তাঁহাকে নিরাশ করিল! পিতা হরিচরণ কলিকাতা হইতে শচীন্দ্রকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। শচীন্দ্র পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিল।

শচীন্দ্র কহিল,—"আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। আমি এখন বিবাহ করিব না।"

পিতা বুঝাইলেন,—"ব্রাহ্মণের জাতি যাইবে। আমি তোমার অক্ষম পিতা। তিনি তোমায় মানুষ করিয়াছেন।"

শচীন্দ্র উত্তর দিল,—"ঈশ্বরের রাজ্যে জাতি আবার কি? আমি ওসব মানি না। বিশেষতঃ তিনি যখন আমার জন্য টাকা খরচ করেছেন, তখন প্রকারান্তরে পণ গ্রহণ করাই হয়েছে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ,—আমি এ বাল্য-বয়সেও বিবাহ করিব না, পণ লইয়াও বিবাহ করিব না।"

পিতা কত বুঝাইলেন; কত মিনতি করিয়া কহিলেন; কিন্তু শচীন্দ্র অটল—অচল। শচীন্দ্র কিছুতেই পিতার কথা শুনিল না।

বিষাদে ক্ষোভে রোষে হরিচরণের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার একবার মনে হইল—তেমন অবাধ্য পুত্রকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। পরক্ষণেই দুর্ব্বলের সম্বল ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হে ভগবান্! এমন পুত্রের মরণই মঙ্গল।" বড় ক্ষোভ হইল—এ পুত্রকে উহার গর্ভধারিণী কেন শিশুবয়সে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন নাই!

শচীন্দ্রের পিতা যেদিন বিফল-মনোরথ হইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গেলেন, শচীন্দ্রের সৎসাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার দুন্দুভিনাদে সহর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার শিক্ষকগণ কেহ কেহ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"তুমিই যথার্থ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলে। তোমার আদর্শ সকল ছাত্র যেদিন পালন করিবে, সেইদিন বুঝিব—দেশ উদ্ধারের দিন নিকটবর্ত্তী।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত-মহাশয়, অন্তরালে থাকিয়া সেই প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলেন। পড়াইতে আসিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, জনান্তিকে কহিলেন,—"এই বটে কর্ত্তব্যপরায়ণতা! এই বটে সৎসাহস! পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন—পিতার অপমান—ইহার অপেক্ষা সৎ-সাহস আর কি হইতে পারে? কর্ত্তব্যপরায়ণতারও পরিসীমা নাই!

যে জন অজস্র অর্থব্যয় করিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিল, তাহারই জাতিনাশ-চেষ্টা! ইহার অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণতাই বা আর কি সম্ভবপর ?”

পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তি—কেহ শুনিল, কেহ শুনিল না। যে শুনিল, সে পণ্ডিত মহাশয়কে ‘বাতুল’ বলিয়া উড়াইয়া দিল। স্কুল-কলেজে সেকেলে টোলের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ ঐরূপ বিশেষণেই বিশেষিত হইয়া থাকেন ?

শচীন্দ্রের মনস্তুষ্টি—তিনি প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—‘বাল্যবিবাহ করিবেন না, বিবাহে পণ লইবেন না।’ তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা তো রক্ষা হইল! একদিকে পিতা ও প্রতিপালনকর্ত্তা, অন্যদিকে সমাজ-সংস্কারক-দলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য তিনি কি কঠোর ত্যাগ-স্বীকারই করিলেন! তাঁহার এ গৌরবের কি তুলনা আছে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরের ক্রোশেক ব্যবধানে নবগ্রাম। নবগ্রামের রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য অতি মহাশয় লোক। তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যামাকান্ত, রায়-মহাশয়ের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রমাকান্ত তখন বহির্ব্বাটীতে বসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। শ্যামাকান্তকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল তো? সকাল সকালই সব শেষ হয়েছে—কেমন?"

শ্যামাকান্ত।—"দাদা! বড়ই সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্রাহ্মণের জাত-কুল যায়!"

রমাকান্ত বসিয়া বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন। ব্রাহ্মণের জাত-কুল যায় শুনিয়া, পুস্তক ফেলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি হয়েছে?"

শ্যামাকান্ত।—"শচীন্দ্র বিবাহ করিতে আসে নাই। কলিকাতায় কলেজের শিক্ষকদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ

আছে—বাল্য-বিবাহ করিবে না, বিবাহে পণ লইবে না। সেই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্যই সে আসে নাই।"

রমাকান্ত।—"এখন উপায়! ব্রাহ্মণের জাত-কুল কি করে রক্ষা হয়?"

শ্যামাকান্ত।—"হরিচরণ আর রায়-মহাশয় দু'জনে আকুলি-ব্যাকুলি কেঁদে সারা হলেন। কোথাও কোনও উপায় কর্‌তে পার্‌লেন না।"

রমাকান্ত।—"কাঁদবারই তো কথা ভাই! এখন উপায় কি হবে বল দেখি?"

শ্যামাকান্ত।—"উপায় তো কিছু ভেবে পাওয়া যায় না।"

রমাকান্ত।—"ব্রাহ্মণের জাত-কুল যায়! যাতে রক্ষা হয়, তার উপায় কিছু ভেবে দেখ-নি ভাই!"

শ্যামাকান্ত।—"আমি আর তার কি ভাব্‌বো?"

রমাকান্ত।—"ব্রাহ্মণের জাত-কুল যা'বার সংবাদটা আন্‌তে পেরেছ; আর সেটা একটু ভেবে দেখ্‌তে পারলে না!"

শ্যামাকান্ত নীরবে অধোবদনে রহিলেন।

পরক্ষণেই রমাকান্ত কহিলেন,—"আচ্ছা, আমার রমেশের সঙ্গে রায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হতে পারে না কি? রমেশ তো প্রায় শচীন্দ্রেরই সমবয়সী! রায় মহাশয়ের পছন্দ হবে

শ্যামাকান্ত।—" সে তো পেলে বেঁচে যায়! কিন্তু দেনা-পাওনার কোনও কথা হলো না, হঠাৎ আমরা কেমন করে ছেলের বিয়ে দিতে পারি? বিশেষ, রায়-মহাশয়ের সঙ্গতিও তেমন কিছু আর আছে বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মণ সমস্তই শচীন্দ্রের পাছে ব্যয় করে ফেলেছেন। সুতরাং ওসব কথা আর না তোলাই ভাল।"

রমাকান্ত।—"ভাই! তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো!"

শ্যামাকান্ত।—"আমি কি সাধ করে বল্‌ছি! বড়-বৌ রমেশের বিয়েয় কত কি পাবেন আশা করে আছেন। রমেশও ঘড়ি, ঘড়ির-চেন, কলিকাতায় পড়ার খরচ ও কত কি আস্‌বাব পাবে—আশা করে।"

রমাকান্ত।—তুমিও কি সেই কথা বল্‌তে চাও? ব্রাহ্মণের এমন বিপদ, আর আমরা কিনা—এখনও ঐ সকল নীচ-চিন্তা মনে স্থান দিচ্চি! হা ধিক্ আমাদের! তুমি এখনই যাও; রায়-মহাশয়কে বলগে,—তাঁহার কন্যার সহিত আমি আমার পুত্রের বিবাহ দিতে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত আছি। যদি তাঁর আপত্তি না থাকে, সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌কি-বেহারা নিয়ে আস্‌বে। কপর্দ্দকের আশা করি না। ব্রাহ্মণের জাতি-রক্ষাই আমার উদ্দেশ্য। তুমি খোলসা করে—অভয় দিয়ে—তাঁকে

শ্যামাকান্ত অবাক। রমাকান্তের হৃদয় যে এত উদার এত উচ্চ, তিনি স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করেন নাই! তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন—সেই পথেই, পাইক সঙ্গে লইয়া, তখনই হরি-পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রমাকান্ত, অন্দরে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে উপদেশ দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ আবার বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ক্ষণপূর্ব্বে যে পুরী হা-হুতাশের তপ্তশ্বাসে দগ্ধীভূত হইতেছিল, নবীন মেঘের নববারিবর্ষণে সে পুরী পুনরায় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

যথানির্দ্দিষ্ট লগ্নে, দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটের পর, সুতহিবুকযোগে, রমেশের করে রায়-মহাশয় সুবালাকে সম্প্রদান করিলেন। শুভলগ্নে শুভক্ষণে নবদম্পতির মিলন হইল। অলক্ষ্যে একজন হাসিল।

বিবাহ-কার্য্যে এবং অতিথি-অভ্যাগতের আহারাদিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। সকল কার্য্যই একরূপ সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইল। কেবল, যাঁহারা বাসর-ঘরে বাসর জাগিয়া আনন্দ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। রূপসী যুবতী কামিনীকুলকে ভরসা দিয়া, ঠান্‌দিদি কহিলেন, —"আজকের বাসর ফস্‌কে গেল বটে; কিন্তু তোদের যে কারো নিত্যিকের বাসরে হাত পড়ে-নি—এই তোরা ভাগ্যি বলে মানিস্।"

* * *

উপসংহার।

কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল,—শচীন্দ্রনাথ এক মুসলমানের কন্যাকে নিকা করিয়াছে।

বৈবাহিকে বৈবাহিকে কথা-প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, —"এ পরিণাম আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ রদের জন্য এবং বিবাহে পণ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যাঁহারা আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি এবংবিধ কথাই বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম,—সমাজ-সংস্কারের আবশ্যক বোধ করিলে, তরল-মতির তরুণ-মস্তিষ্ক চর্ব্বণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, অভিভাবকদিগের সহিত সুযুক্তি সুপরামর্শ করাই শ্রেয়ঃ।"

গৌরী-দান।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

শোভা ও উমা—দুই বোন, উঠানের একপার্শ্বে বসিয়া ধূলা-খেলা খেলিতেছে। ভাঙা ইটের আলি দিয়া দুই বোনে দুইখানি ঘর বানাইয়াছে। সেই ঘরে বসিয়া আপন মনে দুইজনে খেলা করিতেছে।

শোভার ছেলের—একটা কাঠের পুতুলের—যেন বিয়ে হয়েছে। শোভার খেলার ঘরে তাহারই আনন্দ-উৎসব চলিতেছে। শোভা একবার বা ছেলেকে সাজাইতেছে, একবার বা নববধূকে আদর করিতেছে। শোভার ছেলের ফুলশয্যা। সুতরাং সে সাজসজ্জা লইয়াই বিব্রত। খিড়কীর পাশে ভাঁটের গাছে ফুল ফুটিয়া ছিল; ফুলশয্যার জন্য শোভা তাহা তুলিয়া আনিয়াছে। ইট ঘসিয়া সে চন্দন প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে।

শয্যা, উপাধান, গন্ধ-দ্রব্য প্রভৃতি ফুলশয্যার বিবিধ উপকরণ এইরূপ বিবিধ উপাদানে বিন্যস্ত হইয়াছে।

শোভা যখন ফুলশয্যার উপকরণ-সংগ্রহে ও আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, উমা তখন দেব-সেবার আয়োজন করিতেছিল। তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে ধূলায়-ঘেরা একটু মন্দিরের মধ্যে সে একটী শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। একখানি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ঝামা—তাহার শিব-রূপে পরিকল্পিত হয়। শিবের পূজার জন্য, সে ধুতুরার ফুল সংগ্রহ করিয়াছে, বিল্বপত্র চয়ন করিয়া আনিয়াছে। একখানি বড় ও একখানি ছোট মোচার খোলা তাহার কোশা-কুশী হইয়াছে। সেই কোশাকুশীতে একটু জল লইয়া সে শিবপূজা করিতে বসিয়াছে। তাহার আধআধস্বরে কখনও 'বম্ বম্' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; কখনও বা সে চক্ষু মুদিয়া 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং' ধ্যান আওড়াইয়া যাইতেছে। পূজার সময় উমার কোশা-কুশীর জল কয়েক ছিটা শোভার পুতুলের গায়ে গিয়া পতিত হইল। শোভা তখন বর-বধূকে ফুলশয্যায় শায়িত করাইতেছিল। হঠাৎ জলের ছিটা গিয়া তাহার গায়ে পড়ায় শোভা গালাগালি দিয়া উঠিল।

উমা একমনে পূজার ব্রতী ছিল। শুনিয়াও সে যেন সে গালাগালি শুনিতে পাইল না। ক্রোধে অধীরা হইয়া শোভা পুতুল ছুড়িয়া উমাকে প্রহার করিল। মার খাইয়া, উমা

কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভাও কাঁদিতে লাগিল। শোভার কান্নার-ভাবে প্রকাশ পাইল,—উমা যেন তাহার পুতুলগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। পুতুল গড়াগড়ি যাইতেছে দেখিয়া, শোভার মা ছুটিয়া আসিয়া শোভাকে আরও দুই এক ঘা বসাইয়া দিলেন। রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে তিনি কহিতে লাগিলেন,—"আমি রোজ রোজ মানা করি, ওর সঙ্গে খেলা করিস্‌-নে! এত মার খাস্‌, তবু তোর লজ্জা নেই! ফের যদি ওর সঙ্গে কখনও খেলা কর্‌বি, তোকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌বো।"

উমার পিতামাতা উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বালিকাদ্বয়ের বিবাদের কারণ অনুভব করিতে পারিলেও তাঁহারা কোনও কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। তাহাতে তাঁহাদের 'অবিচারে' শোভার মার ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। খেলার ছলে বালিকাদের এমন কলহ প্রায়ই হইত; পিতামাতার নিকট তিরস্কার-লাঞ্ছনা তাহারা প্রায়ই ভোগ করিত; কিন্তু আজ তাহাদের এ দ্বন্দ্বে শোভার মার চক্ষে রমার পিতামাতার 'অবিচারের' চিত্র যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— * ——

রামমোহন ও রমণীমোহন দুই ভাই। রামমোহন বাড়ীতে থাকেন; সংসারের কাজকর্ম্ম দেখেন। রমণীমোহন বিদেশে থাকেন, চাকুরী করেন; মাঝে-মাঝে কখনও বাড়ী আসেন। দু'টি ভাই—যেন একপ্রাণ একমন। বয়সের সামান্য তারতম্য থাকিলেও রমণীমোহন কখনও জ্যেষ্ঠের সমক্ষে মুখ তুলিয়া কথা কহেন নাই। রামমোহনও কনিষ্ঠের কোনও প্রস্তাবে কখনও অসম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই।

কোনও উপলক্ষ নাই, রমণীমোহন আজ হঠাৎ বাড়ী আসিয়াছেন। রামমোহনের মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ আদৌ স্থান পাইল না। রমণীমোহনকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া, তিনি আনন্দে গদগদ হইলেন। কিন্তু রমণীমোহন এবার যেন অন্যরূপ। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণত হইলেন বটে; কিন্তু সম্ভাষণে একটু যেন আন্তরিকতার অভাব অনুভূত হইল।

রামমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংবাদ সব কুশল তো?"

রমণীমোহন কেমন যেন বিকৃতস্বরে উত্তর দিলেন—"হুঁ।"

রামমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"এ সময় ছুটির জন্ম কোনও কষ্ট পেতে হয়-নি তো?" রমণীমোহন অস্ফুটস্বরে কি উত্তর দিলেন, রামমোহনের কর্ণে পৌঁছিল না। ইহার পর রমণী-মোহন শোভার হাত ধরিয়া নীরবে অন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমণীমোহন পথ-পর্য্যটনে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, রামমোহন আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার পর দুই ভ্রাতায় অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। রমণী-মোহন কহিলেন,—"আমি এক দিনের জন্ম ছুটি নিয়ে এসেছি। কাল্ প্রাতেই আমাকে রওনা হ'তে হ'বে। শোভাদের এবার আমি সঙ্গে করে নিয়ে যা'ব।"

রামমোহন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রমণী হঠাৎ কেন এ কথা কহিতেছে! তবে কি বৌমাদের কোনও কষ্ট হয়েছে! আর, সেই সংবাদ পাইয়া রমণী তাঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছে! রামমোহন কোনও কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

রামমোহনকে নীরব দেখিয়া, রমণীমোহন পুনরপি কহিলেন,—"এই রাত্রেই পাল্‌কী-বেহারা ঠিক করিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রাতে দশটার মধ্যে রওনা না হ'লে, ট্রেণ ধর্‌তে পার্‌ব না। ট্রেণ ফেল হলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে।"

রামমোহন।—"তুমি যে কি বল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পারছি-নে!

দিন ক্ষণ নেই; হঠাৎ ঘরের লক্ষ্মীকে কোথায় বিদেশে নিয়ে যাবে? সম্মুখে পূজার ছুটি আস্‌ছে; যদি নিয়ে যেতেই হয়, পূজার ছুটির পর দিন-ক্ষণ দেখে নিয়ে গেলেই চল্‌বে।"

রমণীমোহন।—"এবার আর আমার পূজায় আসা হয় কি না সন্দেহ! এই আজ ছুটি নিয়ে এলাম; আর কি আমায় সদর ছেড়ে আস্‌তে দেবে? পাঁজি-ফাঁজি দেখ্‌তে গেলে, আর চাকুরি করা চলে না। কাল আমার যাওয়াই চাই।"

রামমোহন।—"কাল অশ্লেষা, পরশু মঘা। এ দুই দিন আমি কোনক্রমেই যেতে দিতে পারি না।"

রমণীমোহন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"আমায় যেতেই হবে।"

উত্তর শুনিয়া রামমোহন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠের মুখে এরূপ প্রতিবাদ-ব্যঞ্জক উত্তর তিনি আর কখনও শুনেন নাই। সুতরাং তাঁহার মনে একটু বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। রামমোহন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে প্রত্যুত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া, সঙ্গের চাপরাসী বল্লভসিংকে রমণীমোহন পাল্‌কীর বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিলেন। "যো হুকুম খোদাবন্দ"—বলিয়া বল্লভ-সিং কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইল। রমণীমোহন অন্দরের দিকে উঠিয়া গেলেন।

রামমোহন অকূল চিন্তাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার লক্ষ্মণের মত ভাই—কেন এমন হইল? তিনি যে গরব করিয়া

লোকের কাছে বলিয়া থাকেন—আমার ভাইয়ের মত ভাই কাহারও হয় নাই, কাহারও হইবে না; সে ভাই কেন এমন হইল? কত পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পিতার বড়-আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন; কিন্তু পিতা অকালে লোকান্তরে গমন করায় তাঁহাকে আশানুরূপ লেখাপড়া শিখাইয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর আপনাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, কনিষ্ঠ রমণীমোহনকে লেখাপড়া শিখাইয়া, তিনি সে ক্ষোভ নিবারণ করেন। তার পর, যাহার ছায়া-স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, তাহার হাতে ধরিয়া সুপারিস করিয়া, তিনি রমণীর চাকরী করিয়া দিয়াছেন। সেই রমণী তাঁহাকে আজ এমনভাবে কেন অবজ্ঞা করিল!

পরক্ষণেই রামমোহন মনকে প্রবোধ দিলেন,—"সংসর্গ-বশে বাহ্য ব্যবহার এরূপ হইয়াছে। রমণীর মনের মধ্যে কোনও কপটতা নাই। রমণী যে কাজ করে, কার্য্যগতিকে যেরূপভাবে লোকজনের সহিত তাহার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। নচেৎ, তাহার মনের উদারতা কখনই লোপ পায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে রমণী এখন বড় ক্ষমতার পদ পাইয়াছে। তজ্জন্য, কার্য্যের অনুরোধে, নূতন করিয়া মেজাজ তৈয়ারী করিয়া লইতে হইয়াছে। মনের মধ্যে তাহার কোনও পাপ নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— * ——

পরদিন প্রভাতে স্ত্রীকন্যা লইয়া রমণীমোহন কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। রমণীমোহন কেনই বা হঠাৎ বাড়ী আসিলেন, কেনই, বা হঠাৎ শোভাকে আর তাহার মাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন, রামমোহন তাহার কোনই কারণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—"বিদেশ-বিভূঁই, একলা থাকৃতে কষ্ট হয়, রমণী তাই বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল।"

শোভা জননীর সঙ্গে পালকিতে উঠিল। উমা ছলছল নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরে, যতদূর দৃষ্টি চলিল, পাল্‌কির পানে চাহিয়া চাহিয়া, অবশেষে সে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। জীবনে আর এক বার মাত্র শোভার সহিত উমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল—কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। তার পর হইতে এক-বৃন্তে দুইটী কুসুমকলিকার ন্যায় তাহারা এক সঙ্গে অবস্থিতি করিয়া আসিয়াছে। একত্র শয়ন, একত্র স্নান, একত্র আহার একত্র ক্রীড়া—পরস্পরের মধ্যে কোথাও আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই। খেলা-ঘরে ধূলা-খেলার সময় যদি কখনও পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-

বিচ্ছেদ ঘটিত, সংসারের চিরন্তন প্রথার ন্যায় একের গৃহ-সীমানায় গিয়া অপরে প্রাচীর উঠাইবার চেষ্টা পাইত; কিন্তু সে দ্বন্দ্ব পরক্ষণেই মিটিয়া যাইত,—পরস্পর পরস্পরকে না দেখিলে নিমেষ কাল কাটাইতে পারিত না।

শোভা চলিয়া গেল। বড় সাধের খেলার ঘর পড়িয়া রহিল। উমা এক এক বার শিবপূজার উদ্দেশ্যে খেলা-ঘরের নিকট যায় বটে; কিন্তু যতই শোভার ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখে, ততই তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। সে দেবদেব মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করে,—"ঠাকুর! আমার দিদিকে আর খুড়ীমাকে তুমি শীগ্‌গির এনে দেও।"

শোভা ও উমা সমবয়সী। শোভা ভূমিষ্ঠ হওয়ার একমাস পরে উমার জন্ম হয়। উমা—রামমোহনের এক মাত্র কন্যা।

শোভা চলিয়া গেলে, উমা যেদিন আপন খেলাঘরে শিবের নিকট ছলছল-নেত্রে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানাইতেছিল,—"ঠাকুর! আমার দিদিকে আর খুড়ীমাকে তুমি শীগ্‌গির এনে দেও";—হঠাৎ উমার প্রতি তাহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। রামমোহন গৃহিনীকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন,—"দেখ—দেখ, তোমার মেয়ে কাকে প্রণাম কর্‌ছে।"

গৃহিণী।—"তুমি জান না কি—উমা খেলাঘরে নিত্য শিবপূজা করে! শিবকেই প্রণাম কর্‌ছে বুঝি!"

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উমার মা মনে মনে কহিলেন,—"হে দেবদেব মহাদেব! আমার উমা বাল্যাবধি যেমন তোমার সেবায় নিরত আছে, তুমিই এসে বর-রূপে তারে গ্রহণ ক'রো। তোমার কৃপায় তোমারই করে উমাকে দান ক'রে, আমরা যেন গৌরী-দানের ফল পাই।"

রামমোহন "মা মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে উমার খেলার-ঘরে গিয়া উমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। যুগপৎ তাঁহারও অন্তরে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"হে মহাদেব! বর-রূপে আসিয়া তুমিই আমার গৌরীকে গ্রহণ করিও।"

কন্যাকে কোলে লইয়া মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তুমি তোমার মহাদেবের কাছে কি প্রার্থনা করছিলে মা?"

উমা আধ-আধ-স্বরে উত্তর দিল—"বাবা! দিদি আর খুড়িমা কবে আস্‌বে বাবা?"

রামমোহন ক্ষণকাল নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। উমা জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"মা, বল না মা, আমার দিদি আর খুড়ি-মা কবে আস্‌বে আবার? দিদি না এলে, আমি কারে নিয়ে খেলা কর্‌বো মা?"

জননী কহিলেন,—"এই ক'দিন পরে পূজার সময় তারা আবার আস্‌বে।"

রামমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর দিলেন,—"সে

ভাব তো কৈ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমার রমণী-মোহন যেন সে রমণীমোহন নাই! হয় তো অজ্ঞাতসারে আমরা কি দুর্ব্ব্যবহারই করেছি! আমি বল্‌তে পারি-নে,—বৌমার প্রতি তুমি কখনও কোনরূপ অযত্ন করেছ কি না!"

গৃহিণী সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন,—"আমার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে আমি কখনও তো কোনরূপ যত্নের ত্রুটি করি-নি। তুমি স্বামী—গুরু, সাক্ষাৎ দেবতা। তোমার সাম্‌নে বল্‌ছি, ছোট-বৌকে আমি আমার মায়-পেটের বোনের মত দেখে এসেছি। উমা আর শোভা—আমার চক্ষে অভিন্ন। ঠাকুর-পোকে আমি আমার পেটের ছেলের মত মানুষ ক'রে এসেছি। তার মঙ্গল হয়,—আমি দেবদ্বারে নিত্য সেই প্রার্থনা করি। ঠাকুর-পোকে কেন আমি এবার এমন দেখ্‌লাম? এবার এসে, ঠাকুরপো আমার সঙ্গে একবার ভাল ক'রে কথাও কইলে না। এ ক্ষোভ আমার রাখ্‌বার ঠাঁই নেই।"

ইহার পর, পতি-পত্নী উভয়েই গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে মা মঙ্গল-চণ্ডী! তুমি তাহাদের সুমতি দাও, তুমি তাহাদের মঙ্গল-বিধান কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

কন্যা শোভাকে এবং পত্নী সোহাগিনীকে লইয়া রমণীমোহন যেদিন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, সেদিন যেন তাঁহার অন্তরের একটা অতি-বড় উদ্বেগ দূরীভূত হইল। সোহাগিনী কহিলেন,—“তুমি যদি আর এক দিন দেরী কর্‌তে, আমায় আর দেখ্‌তে পেতে না। আমি বড় কষ্টে তোমায় ঐ পত্র লিখেছিলাম।”

রমণীমোহন।—“দাদা যে এমন বিষকুম্ভপয়োমুখ, আমি কখনও স্বপ্নেও মনে করি নাই। তা'হলে কি তোমায় একদণ্ড ঐ বাড়ীতে থাকতে দিতাম?”

সোহাগিনী।—“যেমন দেবা তেমনী দেবী। তুমি বড়-বৌ বড়-বৌ করে পাগল হও, মায়ের মতন তাঁকে ভক্তি কর; কিন্তু তিনি যে কি ডাকিনী, তোমাকে আর কি বল্‌ব? তোমার হাকিমী চাক্‌রী—এ হিংসায় তিনি জলে ম'লেন। তোমার দিব্যি, আমি এক বিন্দু যদি বাড়িয়ে ব'লে থাকি! তুমি হয় তো মনে কর্‌তে পার—আমি তাঁর পর, আমি তাঁর

নিচ্ছে কয়ছি। তোমার মেয়েকেই তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখ। দুধের বালক, ও তো মিছে কথা কইবে না!"

রমণীমোহন।—"আমি এখন সব জেনেছি—সব বুঝেছি। এবার আমার চোক ফুটেছে।"

সোহাগিনী।—"আমাদের ওখানে রাখ্‌বার জন্ত এত পীড়াপীড়ি কেন বুঝেছ কি? পাছে খরচ-পত্র কিছু কম পাঠাও, তাই অত আত্মতাই। যত নফর-চপর—তোমার টাকাতেই তো!"

রমণীমোহন।—"এতদিন তোমার এ সকল কথা খোলসা করে লেখা উচিত ছিল।"

সোহাগিনী।—"উপরের দিকে থুতু ফেল্‌তে গেলে মুখে পড়ে। কাজেই এতকাল বড় কষ্ট সহ্য করে এসেছি। নিতান্ত অসহ্য না হলে আর তোমার উত্যক্ত করি-নি। বল্‌বো কি দুঃখের কথা, বল্‌তে সরম আসে, এদানী আমাদের সম্বন্ধে এক পয়সা ব্যয় কর্‌তে হ'লে কর্ত্তা-গিন্নির যেন প্রাণ ফেটে বিদীর্ণ হতো। আমার আর আমার এই কচিমেয়েটার—আমাদের আর কি ব্যয় ছিল? আমার তো, জানই তুমি, একবেলা এক মুটোতেই প্রাণ আইঢাই করে। আর ঐ মেয়েটা—ঐ কি ছাই পেট পুরে খেতে পেয়েছে? কি কষ্টে দিন কেটেছে, তার কি বল্‌বো?"

রমণীমোহন।—"ওরা এত বড় পিশাচ! এ কথা আমার

এতদিন বল নাই কেন?” রমণীমোহন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—“বাড়ী-ঘর উড়ে-পুড়ে উচ্ছিন্ন যাক, সেও স্বীকার; শর্ম্মারাম আর কাকেও এক পয়সা দিচ্ছেন না।”

অনলে ইন্ধন-প্রক্ষেপের ন্যায় সোহাগিনী কহিলেন,—“শুধুই কি পেটে মারা! অনেক সময় হাতে-মারার ভয়েও সঙ্কুচিত থাক্‌তে হয়েছিল। তোমার দাদাটি তো নয়, সর্ব্বদাই যেন অগ্নিশর্ম্মা! তোমার বউ-দিদি আবার তাঁরে বাড়া! বল্‌বো কি দুঃখের কথা, আমার দুধের মেয়েটাকে পর্য্যন্ত অনেক সময় বেঁধে মেরেছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আহা! বাছার আমার হাড়-ক'খানা যে ফিরে আন্‌তে পার্‌বো, এ আশা আর ছিল না।” বলিতে বলিতে সোহাগিনীর নয়ন-প্রান্তে অশ্রুসঞ্চার হইল।

রমণীমোহন দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল,—“তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হাকিম। তাঁহার কন্যার ও স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার!” দণ্ডবিধির ধারা-সমূহ তাঁহার মানস-পটে প্রতি-ভাত হইতে লাগিল। রোষে ক্ষোভে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, —“কি বল্‌বো আমার মার পেটের ভাই। নইলে, এ অত্যাচারে দণ্ডের ব্যবস্থা অনায়াসেই কর্‌তে পার্‌তাম।”

সোহাগিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—“তুমি নেহাত ভাল-মানুষ—নেহাত ধর্ম্মভীরু। তোমার মত ভালমানুষ ভাই পেয়েছিল বলেই এ যাত্রা তরে গেল।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন কাটিল। মাসের পর মাস কাটিল। শরতে—আশ্বিনে—মহামায়ার আগমনে দিক্ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। পরিত্যক্ত নিরানন্দ পল্লী-গৃহে বৎসরান্তে আনন্দ-কল্লোল উত্থিত হইল।

বহুদিনের পৈতৃক পূজা। রমণীমোহনের চাকরী হওয়ার পর, রামমোহন পূজার আড়ম্বর বৃদ্ধি করেন। পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি মার প্রসাদ পাইবার জন্য আমন্ত্রিত হন। অভ্যাগত অতিথি কাঙ্গালীর জন্য ভূরি-ভোজনের আয়োজন হয়।

উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর মহা আড়ম্বরে পূজা চলিয়াছে। এবারও সেইরূপ আড়ম্বরে মহাপূজা সম্পন্ন হইবে—রামমোহনের আশা ছিল। কিন্তু সহসা হরিষে বিষাদ ঘটিল। স্ত্রীকন্যাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাওয়ার পর, রমণীমোহন সে সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধই প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। খরচ-পত্র

এখন আর তিনি কিছু পাঠান না। পত্র লিখিলে উত্তর পর্য্যন্ত দেন না। দাদার নামেই তিনি এখন জ্বলিয়া উঠেন।

কনিষ্ঠ-গত-প্রাণ রামমোহন বরাবর মনকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছিলেন,—"বড় চাক্‌রী—বড় ঝঞ্ঝাট! তাই বুঝি রমণী পত্র লিখিবার অবসর পায় না।"

খরচ-পত্রের বিষয়?—রামমোহন ঋণগ্রস্ত হইয়া নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছিলেন। বড় ভরসা—রমণী বাড়ী আসিলে সে ঋণ পরিশোধ করিবেন!

মহাপূজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আড়ম্বরেই সম্পন্ন করিবেন—আয়োজন করিতেছিলেন। রমণীমোহন বাড়ী আসিলে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে। রমণীমোহনের আগমন-প্রতীক্ষায় তাই তিনি দিনের পর দিন গণিতেছিলেন।

রমণীমোহনকে ও তাঁহার স্ত্রীকন্যাকে আনিবার জন্য এবার রামমোহন আপনার পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিদামচন্দ্রকে পূর্ব্ব হইতেই প্রেরণ করিয়াছেন। রমণীমোহন নিশ্চয় আসিবেন, ছিদামচন্দ্র কথনই তাঁহাদের ছাড়িয়া আসিবে না,—এই বিশ্বাসে রামমোহনের চিত্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত আছে। যেখানেই থাকুন, রমণীমোহন পঞ্চমীর দিন বাটী আসিবেন—রামমোহনের অটল বিশ্বাস।

পঞ্চমী অতীত হইল। রমণীমোহন আসিলেন না। ভৃত্য

ছিদামচন্দ্রও প্রত্যাবৃত্ত হইল না। রামমোহনের প্রাণে যুগপৎ আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইল।

"রমণীমোহন কি আসিল না? ছিদামচন্দ্র যখন প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই, রমণীমোহন নিশ্চয় আসিবে।"

আশায় আশায় ষষ্ঠীর দিনও কাটিয়া গেল। রমণীমোহন আসিলেন না।

পূজার আড়ম্বর যথাবৎ চলিতে লাগিল। রামমোহন মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট নিরাশ-ভাব প্রকাশ করিলেন না।

সপ্তমীর দিন দ্বিপ্রহরে ছিদামচন্দ্র একাকী ফিরিয়া আসিল। ছিদামচন্দ্রকে একাকী প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রামমোহন জগদম্বার চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"মা! এ কি করিলি মা?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উমা প্রতিদিনই প্রায় জিজ্ঞাসা করে,—"কৈ বাবা, দিদি তো কৈ এলো না?"

রামমোহন কন্যাকে প্রবোধ দিবার জন্য অবান্তর কথার অবতারণা করেন। পরিশেষে বলেন,—"তোমার বিয়ের সময় মা, আমি নিজে গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌বো। সেও তো—এই অগ্রাণ মাস!"

কন্যা নতমুখে নীরবে পিতার চরণপ্রান্তে চাহিয়া কি যেন কি ভাবিতে থাকে। পরক্ষণেই একান্তে সরিয়া যায়। রামমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলেন,—"আমার আশা কি পূর্ণ হবে? আমি কি গৌরী-দানে সমর্থ হবো? দেবদেব মহাদেব সত্যই কি বর-রূপে আসিয়া আমার উমাকে গ্রহণ করিবেন?"

একদিন নিভৃতে দাঁড়াইয়া রামমোহন মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন; সহসা পত্নী আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

পতিকে সম্মুখে পাইয়া, তাঁহার আনন্দ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দগদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"অনেক ক্ষণ থেকে

একটা কথা বল্‌বো ব'লে তোমায় খুঁজ্‌ছি। প্রভাতের স্বপ্ন সত্য হয়—নয়?"

রামমোহন অন্যমনস্ক ছিলেন। পত্নীর শেষ কথা তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় চমক্ ভাঙ্গিল। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?—কি স্বপ্ন দেখেছ?"

পত্নী।—"বড় আনন্দের স্বপ্ন! দেবদেব মহাদেব আমার সে স্বপ্ন কি সফল কর্‌বেন?"

এই বলিয়া পত্নী দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে প্রণতি জানাইলেন। রামমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি আনন্দের স্বপ্ন? বলই না শুনি!"

পত্নী।—"স্বপ্ন দেখেছি,—দেবদেব মহাদেব বর-বেশে এসে আমার উমাকে গ্রহণ কর্‌ছেন।"

রামমোহন।—"স্বপ্ন আনন্দেরই বটে; কিন্তু ভাব্‌ছি, কি করে এ স্বপ্ন সফল হবে? মধ্যে আর একটী মাস। এর মধ্যে যদি পাত্রের যোগাড় না হয়, গৌরী-দানের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আমি অকূল ভাবনায় পড়েছি। একান্তে সেই ভাবনাই ভাব্‌ছিলাম এতক্ষণ!"

পত্নী।—"কেন, যে পাত্রের কথা বলেছিলে, সে পাত্র তো এখনও হাতছাড়া হয়-নি! সেই পাত্রই ঠিক কর।"

রামমোহন।—"পাত্র তো ঠিকই আছে! কিন্তু আমার যোগাড়-

বস্ত্র কৈ? দানপণের কোনই সংস্থান নেই। গহনা-পত্র কিছুই প্রস্তুত হয়-নি। বিশেষতঃ হাত শূন্য হয়ে পড়েছে। মহাপূজার ব্যয়নির্ব্বাহে কিছু ঋণগ্রস্তও আছি। কি কর্‌ব, তাই ভাবছি।"

পত্নী।—"রমণী নিশ্চয়ই সাহায্য কর্‌বে। আমার উমাকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে। উমার বিয়েয় সে কখনও নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার্‌বে না। পত্র লেখা-লেখি নয়; তুমি নিজে একবার তার কাছে যাও।"

রামমোহন।—"আমারও তাই বিশ্বাস বটে! তবে পূজার সময় বাড়ী না আসায়, আর ছিদামের মুখে তার ভাবভঙ্গীর বিষয় অবগত হওয়ায়, মন্‌টা বড় দমে আছে।"

পত্নী।—"তা হোক। তোমায় দেখ্‌লে আর উমার বিয়ের কথা শুন্‌লে, রমণী কখনই নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার্‌বে না। তুমি যাও; একটা দিন দেখে, দু'চার দিনের মধ্যেই রমণীর নিকট যাও। মা মঙ্গলচণ্ডী নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।"

রামমোহন।—"উপায় তো আর নেই! একেই বিষম ঋণ-জালে আবদ্ধ; তার উপর কোথাও ঋণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। রমণীকে সব বুঝিয়ে বল্‌লে, সে নিশ্চয়ই শুন্‌বে।"

সেই পরামর্শই স্থির হইল। অগ্রহায়ণ মাসেই রামমোহন উমার বিবাহ দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। পরামর্শের তৃতীয় দিবসে, রামমোহন রমণীমোহনের নিকট রওনা হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

সন্ধ্যার পর রমণীমোহন বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। দুই জন অন্তরঙ্গ বন্ধু পার্শ্বে বসিয়া চা-সেবনে গাল-গল্পে মস্‌গুল হইয়া আছেন। তাঁহাদের গল্পের বিষয়—প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কার। রমণীমোহন মহকুমার ভার-প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া মহকুমার বিবিধ উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। প্রতিদিন প্রায় সেই কথারই আলোচনা চলিত। আজ প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা নূতন কথার আলোচনা আরম্ভ হইল।

বন্ধু হরচন্দ্র কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আপনার দাদা এসেছেন—নয়? হঠাৎ কি মনে করে?"

রমণীমোহন।—"এখনও কিছু খুলে বলেন-নি।"

হরচন্দ্র।—"তবু! ভাবখানা কি—কিছু বুঝ্‌তে পারেন-নি কি? আপনি লোক চরিয়ে বেড়ান, লোকের পেটের কথা টেনে বা'র করেন; আপনি নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু বুঝেছেন।"

রমণীমোহন।—"সেই যা সেদিন বলাবলি কর্‌ছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়।"

হরচন্দ্র।—"আপনি কি উত্তর দেবেন, মনে করেছেন?"

রমণীমোহন।—"আপনারাই বলুন না কেন,—কি উত্তর দেওয়া যায়?"

হরচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া নরচন্দ্র চা খাইতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। এবার কিন্তু তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক নরচন্দ্র কহিলেন,—"আপনি এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কি উত্তর দিবেন? আপনি সমাজ-সংস্কার-রূপ যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে, দাদাই হউন—আর বাবাই হউন, ঐরূপ প্রস্তাব লইয়া কেহ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। নেহাত ভালমানুষ আপনি, তাই অসহ্য সহ্য করিতে পারেন। আমি হ'লে অমন দাদার মুখ-দর্শন করি না।"

হরচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন,—"এসেছেন, আসুন। কিন্তু সমাজের অনিষ্টকর কোনও প্রস্তাব আপনার সমক্ষে তিনি যেন বল্‌তে সাহস না করেন। বিশেষ, আমরা যদি সাম্‌নে থাকি, আর তদ্রূপ কোনও প্রস্তাব উথাপন কর্‌তে দেখি, নিশ্চয় জান্‌বেন, তিনি আমাদের কাছে অপমানিত হবেন। কি আস্পর্দ্ধার

কথা!—আট বছরের মেয়ের বিয়ে দেবে! কথাটা মুখে আনতে একটু লজ্জা হলো না!"

রমণীমোহন।—"আপনারা আগে অত উতলা হন কেন? তিনি তো এখনও কিছু বলেন-নি। আগে শোনাই যাক্, তিনি কি বলেন!"

হরচন্দ্র।—"বলার আর বাকী কি? তিনি যখন এতদূর আস্তে পেরেছেন, তখন বলাই হয়েছে। আপনি মনে রাখ্বেন, আপনি আমাদের বাল্য-বিবাহ-নিবারিণী সভার সভাপতি। আরও মনে রাখ্বেন—আপনি সেদিন গবরমেণ্ট-স্কুলের পঞ্চাশ জন ছাত্রকে কি ব'লে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এসেছেন! এই সব কথা মনে রেখে, তবে তাঁর সঙ্গে কথা কইবেন।"

রমণীমোহন।—"আপনারা কি কর্তে বলেন, তাই বলুন?" আপনারা যা বল্বেন, আমি তাতেই প্রস্তুত।

হরচন্দ্র নরচন্দ্র দুইজনে সমস্বরে কহিলেন,—"এ কি আর বল্তে হবে? আপনি কি কিছু বোঝেন না? এখনই তাঁকে এ বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেন। তাঁর সঙ্গে আর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত কর্বেন না?"

নরচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"দণ্ডবিধিতে এত ধারা আছে। আর এই গুরুতর অপরাধের একটা ধারা নাই! যাহারা বাল্যবিবাহের উদ্যোগী, তাহারা প্রকারান্তরে

নরহত্যার সহায়তা করে। সর্ব্বদর্শী ইংরাজ-রাজ!—এ অপরাধের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি পড়িল না!"

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আলোচনা-গবেষণা চলিল। রমণী-মোহন চা খাইতেন না। চার পরিবর্ত্তে ঔষধার্থে সুরাপান ব্যবস্থার অনুসরণে একটু একটু 'ব্রাণ্ডি' পান করিতেন। কথায় কথায় আজ তাহার মাত্রা একটু বাড়িয়া গেল। উত্তেজিতকণ্ঠে খান-সামাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"কে দাদা! কার দাদা! দাদাকে কাল প্রাতেই বাড়ী যেতে বলিস্। আমি আর তাঁর মুখ-দর্শন কর্‌তে চাই না।"

খান্‌সামা কি ভাবে কি কথা বলিয়াছিল, সেই জানে; আর যাঁহাকে বলিয়াছিল, তিনিই জানেন। প্রভাতে কেহই কিন্তু আর সে বাড়ীতে রামমোহনকে দেখিতে পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পত্নীর প্রাণভরা আশা—'তিনি যখন গিয়াছেন, রমণী কখনই বিমুখ করিতে পারিবে না; নিশ্চয়ই তিনি সফলকাম হইয়া আসিবেন।'

বিবাহের দিন স্থির—লগ্ন স্থির। রামমোহন কবে রমণী-মোহনের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাও পাকা স্থির ছিল। কিন্তু রামমোহন নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না।

পত্নী তারাসুন্দরী প্রথম দিন মনকে প্রবোধ দিলেন। দ্বিতীয় দিনও মনকে প্রবোধ দিতে পারিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন মন আর প্রবোধ মানিল না। নানা দুশ্চিন্তা-তরঙ্গ মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এদিকে, রামমোহন কি-ভাবে রমণীমোহনের নিকট নিগৃহীত হইয়া সেই রাত্রিতেই সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, সে সংবাদও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তারাসুন্দরীর কর্ণে আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব ঘটিল না। তারাসুন্দরী বিষম নৈরাশ্য-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

"তিনি কোথায় গেলেন? অপমানে অভিমানে তবে কি বিবাগী হইয়া চলিয়া গেলেন? কেন এমন ঘটিল?" তারাসুন্দরী ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলেন না। তাঁহার একবার মনে হইল,—"হতাশার সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া তিনি তবে কি সংসার-ত্যাগী হইলেন?" কিন্তু তখনই আবার অন্তরে ধ্বনিত হইল,—"না—না, তিনি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্; তিনি কখনই কর্ত্তব্য-কর্ম্মে উদাসী হইতে পারেন না।" পরক্ষণেই প্রশ্ন উঠিল,—"তবে তিনি প্রত্যাবৃত্ত নহেন কেন? তিনি যদি প্রাণে প্রাণে জীবিত থাকিতেন, কখনই এমনভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।" ভাবিতে ভাবিতে তারাসুন্দরীর বক্ষঃস্থল অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"হে বিপত্তের মধুসূদন! বিপদ দূর করুন।"

জননীর ব্যাকুলতা দেখিয়া, আপনার খেলার ঘরে—ঠাকুর ঘরে গিয়া, উমা প্রার্থনা জানাইল,—"হে দেবদেব মহাদেব! তুমি আমার বাবাকে শীগ্‌গির এনে দেও।" একান্তে বসিয়া বালিকা বারবার মহাদেবের নিকট আপন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। পরিশেষে, অনেক ক্ষণ পরে, মার নিকট আসিয়া আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিল,—"মা—মা! বাবা আমার শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌বেন।" তারাসুন্দরী কন্যাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!"

নবম পরিচ্ছেদ।

রমণীমোহনের উত্তর রামমোহনের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেল-সম বিদ্ধ হইয়াছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সে গৃহ পরিত্যাগ করেন।

রামমোহন ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দিয়া রমণীমোহনের কক্ষে প্রবেশ করিবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন। রমণীমোহন বন্ধু-বান্ধব-সহ বৈঠকখানায় আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। একান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার বাসনায়, তিনি ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভৃত্যকে আর উত্তর লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় নাই;—ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই, অন্তর হইতে রমণীমোহনের অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া, তিনি রোষে ক্ষোভে বিষাদে অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি কোথায় অদৃশ্য হইলেন? নির্দ্দিষ্ট দিনে বাড়ী ফিরিলেন না; কন্যার বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল, তাহারও কোন ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি কোথায় গেলেন?

রামমোহনের প্রথমে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি মুখের গ্রাস দিয়া যে ভাইকে মানুষ করিয়াছেন, সেই ভাই তাঁহার সম্পর্কে এমন ব্যবহার করিল? এ ব্যবহার তিনি কখনও স্বপ্নেও মনে করেন নাই। তাই অনুশোচনার অন্তর্দাহে প্রাণ দগ্ধীভূত হইল। তিনি অবিলম্বে রমণী-মোহনের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথে একান্তে একটী নদীতীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন দুশ্চিন্তার প্রবল তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে আপনা-আপনিই কহিতে লাগিলেন,—"ভাই আমার মুখ দেখিতে চাহে না! তাহাতে যদি সে সুখী হয়, হেক। কেবল রমণীকে কেন, আমার এ মুখ যে আর কাহাকেও দেখাইবার ইচ্ছা হয় না! আমি কি বলিয়া লোকসমাজে মুখ দেখাইব? লোকে যখন জিজ্ঞসা করিবে,—উমার বিবাহের কি হইল?—আমি কি উত্তর দিব! লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে,—রমণীকে কি সাহায্য করিল?—তখনই বা কি উত্তর দিব। আমি কোন্ মুখে বলিব—বিবাহ হইল না! আমি কোন্ মুখে বলিব—রমণী কোনই সাহায্য করিল না!" আপন মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে, আবেগভরে রামমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হে সহস্র-লোচন! তোমার বজ্র এখনও আমার মস্তক লক্ষ্য করিল না কেন? বজ্রধর!—তোমার

বজ্র আমার মস্তকে এখনই নিক্ষেপ কর! আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক।”

একজন পথিক দূর হইতে সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন।

প্রভাতকল্পা সর্ব্বরী। পাথক অতি-প্রত্যুষে কার্য্য-ব্যপদেশে সেই পথে গমন করিতেছিলেন। চীৎকার শুনিয়া, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পথিকের মনে হইল,—‘এ ব্যক্তি কি উন্মাদ?’ কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইল। পথিক বুঝিলেন—বিষম মনস্তাপে ব্রাহ্মণ আত্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন।

অবস্থা বুঝিয়া পথিক সান্ত্বনা-দানে কহিলেন,—“আপনি কি প্রলাপ বকিতেছেন? তরঙ্গ দেখিয়া নাবিক যদি হাল ছাড়িয়া দেয়, আরোহিগণের কি অবস্থা হয়, ভাবিয়া দেখুন দেখি? আপনার কন্যাদায়। আপনি যদি নিশ্চেষ্ট হন, জাত-কুল কে রক্ষা করিবে?”

রামমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,— “কে আপনি—আমার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন? তবে আপনি আমার সকল অবস্থা অবগত নহেন; তাই আমায় ভরসার কথা কহিতেছেন। আমি নিরুপায়!—চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।”

ক্ষণকাল পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিল। পথিক উপসংহারে কহিলেন,—“আপনি আমার পরামর্শ শুনুন। রাজা তেজশ্চন্দ্রের

নিকট গমন করুন। আপনার কন্যাদায়ের কথা শুনিলে, তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।"

রামমোহন।—"সংবাদপত্রে তাঁহার দানশীলতার কথা শুনিয়াছি বটে! যদিও ভিক্ষাবৃত্তি চিরঘৃণ্য; কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আমি, আমার যখন উপায়ান্তর নাই, কাজেই আমায় সে বৃত্তিও অবলম্বন করিতে হইল।"

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন নীরবে অধোবদন রহিলেন।

রাজসন্নিধানে যাইবার জন্য পথিক তাঁহাকে পুনরায় উৎসাহান্বিত করিতে চেষ্টা পাইলেন।

বহু বিচার-বিতর্কের পর, রামমোহন রাজদরবারে সাহায্য-প্রার্থী হইতে সম্মত হইলেন। যে ভাবে রাজদরবারে উপস্থিত হইতে হইবে, পথিক যথাসাধ্য তাঁহাকে তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

---*---

পাত্র-মিত্র-সভাসদ্-পরিবেষ্টিত রাজা তেজশ্চন্দ্র, জলমধ্যস্থিত প্রস্ফুটিত কমলবৎ শোভা পাইতেছিলেন; অথবা, মধুমক্ষিকা-বেষ্টিত মধুচক্রের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।

পথিকের পরামর্শানুসারে বহুকষ্টে ব্রাহ্মণ রাজদরবারে প্রবেশ-লাভ করিলেন।

সারাদিন কাটিয়া গেল। কোনক্রমেই রাজার নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। প্রথম দিবস এইভাবে অতিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় দিবসে কোনপ্রকারে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট মনোভাব জ্ঞাপনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তৃতীয় দিবসে রাজার নিকট সে প্রার্থনা পৌছিবার অবসর ঘটিল। সেই দিন সভাস্থলে রাজা তেজশ্চন্দ্রের বহু দান-সমাচার বিঘোষিত হইতেছিল। রাজা তেজশ্চন্দ্রের সেদিনের প্রথম দান—বিশ সহস্র মুদ্রা। আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রে একটী 'লাইট্ হাউস্' (আলোকগৃহ) স্থাপিত না হইলে, বৈদেশিক বণিকগণের অর্ণবপোত গতায়াতে অসুবিধা ঘটে। সেই আলোক-গৃহ প্রস্তুতের জন্য 'হনুলুলুর' বণিকসভা প্রার্থনা

করিয়াছেন। প্রার্থনার সঙ্গে সুপারিশ ছিল। দাতার আনন্দ—হনুলুলু পর্য্যন্ত তাঁহার নাম পৌছিয়াছে। পারিষদগণ বলিতেছেন,—'মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের তেজ পৃথিবী পরিব্যাপী।' সুতরাং দান—বিশ সহস্র মুদ্রা। দ্বিতীয় দান—দুই সহস্র মুদ্রা। এক জন চা-কর ফরাসী-সাহেব দেশে যাইবার জন্ম সাহায্য-প্রার্থনা করায়, ঐ দান মঞ্জুর হইল। এইরূপ নানাবিধ দানের পর, একটী বিদ্যামন্দির-নির্ম্মাণে দানের প্রসঙ্গ উঠিল। রাজা তেজশ্চন্দ্রেরই জমিদারীর মধ্যে কোনও গণ্ডগ্রামে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। হঠাৎ অগ্নিদাহে সেই বিদ্যামন্দির ভস্মসাৎ হয়। গ্রামবাসীরা তাই রাজদরবারে সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। রাজা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন—পাঁচ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশিত হইল,—"প্রজা বেটারা বড় বদ হইয়াছে। রাজসংসারের অর্থ শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া আগুন দিয়া ঘর পুড়াইয়াছে। দুষ্ট প্রজাদের দণ্ডস্বরূপ ঐ গ্রাম হইতে সহস্র মুদ্রা রাজকোষে আদায় করা প্রয়োজন।" সর্ব্বশেষে রামমোহনের সাহায্যপ্রার্থনার বিষয় আলোচিত হইল। রাজা তেজশ্চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—"এক জন ব্রাহ্মণ, কন্যার বিবাহে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন।" পারিষদগণের মধ্যে এক জন অমনই বলিয়া উঠিলেন,—"কন্যার বিবাহে আবার সাহায্যের দরকার কি আছে? কলিকাতার সংবাদপত্রের আন্দোলনের ফলে দান-পণ তো সব উঠিয়াই গিয়াছে!

কত পাত্র এখন, বিনা-পণে বিবাহ করিবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দিতেছে।" জনৈক কর্ম্মাধ্যক্ষ উহাতে একটু রসান চড়াইয়া কহিলেন,—"শুনেছেন আবার, ব্রাহ্মণের মেয়ের বয়স আট বৎসর মাত্র। তিনি নাকি এই বিবাহে গৌরী-দানের ফল লাভ করিতে চান।" রাজা তেজশ্চন্দ্র উত্তর দিলেন,—"বাল্য-বিবাহের পোষকতা করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।" সঙ্গে সঙ্গে একজন পারিষদ বলিয়া উঠিলেন,—"কন্যার বিবাহ ছলামাত্র। ব্রাহ্মণ প্রতারক! উহাকে এখনই পুলিশে দেওয়া উচিত।" এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, প্রার্থীর প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া কহিতে গেলেন,—"অভাবগ্রস্ত না হইলে কেহ কখনও প্রার্থী হয় না।" কিন্তু বৃদ্ধের সে উক্তি আকাশে মিশিয়া গেল। তাঁহাকে বাধা দিয়া কেহ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ প্রতারক;" কেহ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ সমাজদ্রোহী।" প্রায় একবাক্যে সিদ্ধান্ত হইল,—"এরূপ প্রার্থীকে সাহায্য করা—ধর্ম্মবিগর্হিত, সমাজবিগর্হিত, নীতি-বিগর্হিত কার্য্য।"

রামমোহন মনে মনে কহিলেন,—"মা বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হও। তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।" অনেক ক্ষণ তিনি যেন স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। সভাভঙ্গে সকলে চলিয়া গেল। পরিশেষে দ্বারবানেরা রামমোহনকে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে চিন্তার অকূল সমুদ্র। রামমোহন কেমন করিয়া সে চিন্তা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন ?

এইরূপ সঙ্কট-সমস্যায় পড়িয়াই মানুষ আত্মহত্যায় উদ্‌বুদ্ধ হয়। রামমোহনেরও তাই একবার মনে হইল—এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃসাধক নহে কি ? কিন্তু পরক্ষণেই তাহাতে সংশয় আসিল। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ; পরলোক আস্থা-বান্। সুতরাং আত্মহত্যায় দেহের অবসান হইলেও চিন্তার অবসান হইবে বলিয়া আশ্বাসবান্ হইতে পারিলেন না। বুঝিলেন —সকলই কর্ম্মফল ; অনুশোচনা নিষ্ফল মাত্র।

মনে পড়িল—গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয় ! মনে পড়িল—তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার কন্যা ও সহধর্ম্মিণী কতই না ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে ! আর মনে পড়িল—উমার বিবাহ-সম্বন্ধে যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতে সেই পাত্রের পিতামাতাও না-জানি কত উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন ! উমার বিবাহ-দানে সমর্থ হউন বা না হউন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে তিনি অবশ্যই বাধ্য।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যার বিবাহ-দানে সমর্থ হইলেন না—এই কথা প্রথমে পাত্রপক্ষকে জানাইয়া পরিশেষে গৃহে ফিরিবেন,—ইহাই স্থির করিলেন।

পাত্রের বাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর যাইতে হইল না। পথেই পাত্রের পিতা সদানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

পাত্রীপক্ষের কোনও সংবাদ না পাইয়া, সদানন্দ নিজেই সংবাদ লইতে আসিতেছিলেন। রামমোহনের চিত্ত যখন এইরূপ উদ্বেগ-পূর্ণ, তখন পরস্পরের সাক্ষাৎকার ঘটিল।

রামমোহনকে দেখিয়াই সদানন্দ কহিলেন,—"বেয়াই! অনেক দিন তোমার সংবাদ পাই নাই। তাই উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছিলাম। পথে দেখা হইল, ভালই হইল! বাড়ীর সব কুশল তো?"

বৈবাহিক সম্বোধনে রামমোহন অধিকতর বিচলিত হইলেন। কহিলেন,—"মহাশয়! আপনি আমায় আর ওরূপ সম্বোধনে লজ্জা দিবেন না। আপনার সহিত শুভসম্বন্ধ-স্থাপনের সুখ-সৌভাগ্য এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিল না।"

সদানন্দ।—"আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেন—আমার পক্ষে কি ত্রুটি দেখিলেন?"

রামমোহন কাতরকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"আপনার কোনও ত্রুটি নাই। আমি বড় হতভাগ্য, কোনই যোগাড় করিতে

পারিলাম না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি কথা রক্ষা করিতে অসমর্থ।"

সদানন্দ।—"আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি বলিতেছেন! যদি কোনও ত্রুটি হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।"

রামমোহন কাঁদিয়া ফেলিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"সদানন্দ! আপনি সত্যই সদানন্দ! আমি বড় দুর্ভাগ্য, তাই আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে আনন্দলাভে সমর্থ হইলাম না!" প্রকাশ্যে জানাইলেন,—"আমার সকল আশা-ভরসা শেষ হইয়াছে। আমি একটি কপর্দ্দক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং কন্যার বিবাহ কেমন করিয়া দিব? আপনার চরণে ধরি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া রামমোহন সদানন্দের চরণ ধারণ করিতে গেলেন।

"করেন কি! করেন কি!"—বলিয়া সদানন্দ সরিয়া দাঁড়াইলেন। রামমোহনের অবস্থার বিষয় সমস্তই তাঁহার অনুভূত হইল। রমণীমোহনের ব্যবহারের বিষয়ও তিনি কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"বেয়াই! আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনি একটা হরিতকি দিয়া কন্যা-দান করিবেন। আমি দান-পণ কিছুই চাহি না।"

সদানন্দ কি দেবতা! অথবা, সদানন্দ ছলনা করিতেছেন! তাঁহার অযাচিত অনুগ্রহ-দান-ইচ্ছায় রামমোহন বড় সঙ্কোচ

অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন,—"না—না! আপনাকে এতদূর ক্ষতি স্বীকার করিতে বলি না। আমার কন্যার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আপনার পুত্রের বিবাহ আপনি অনায়াসে অন্যত্র প্রদান করিতে পারেন।"

সদানন্দ।—"আপনি কেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন? আমি পুত্রের বিবাহে দান-পণ কিছুই গ্রহণ করিব না বলিয়া আপনি একটুও লজ্জিত হইবেন না। কৌলীন্য-মর্য্যাদা হিসাবে একটী কপর্দ্দক বা একটী হরিতকী পাইলেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। আপনার কন্যা, আপনার জামাতা;—আপনারই থাকিবে। দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ—সে তো চির-কালই আছে! সময় হয়, আপনার কন্যা-জামাতাকে আপনি যথেচ্ছ-সামগ্রী দান করিবেন। এখন আমিও যাহা লইতাম, নিশ্চয় জানিবেন, তাহা উহাদেরই থাকিত। আপনি কখনই আমাকে এমন পিশাচ মনে করিবেন না যে, পুত্রের বিবাহের অর্থে আমার নিজের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল! পাত্র যদি আপনার পছন্দ হইয়া থাকে, আমার সহিত কুটুম্বিতায় যদি ঘুণাক্ষরেও আপনার কোনরূপ অমত না থাকে, চলুন, সাধ্যমত বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করা যাউক।"

রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া সদানন্দ বিবাহের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের জন্য গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মরুভূমে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। নিরানন্দ ভবনে আনন্দের শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সামান্য যাহা কিছু সংস্থান ছিল, তাহা দিয়াই রামমোহন কন্যা-সম্প্রদান করিলেন। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। সত্য সত্যই যেন বর-রূপে মহেশ্বর আসিয়া উমা-রূপিণী গৌরীকে গ্রহণ করিলেন। আনন্দ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। সংসার দেখিল,—হিন্দুসমাজ কত উদার—কত মহান্! সমাজে কৌলীন্য-মর্য্যাদাও আছে, সহৃদয়তাও আছে। যিনি মানুষ, তিনি কখনই মনুষ্যত্বহীন নহেন।

উমার বিবাহের সংবাদ যথাসময়ে রমণীমোহনের নিকট পৌঁছিল। সে সংবাদে রমণীমোহনের রোষানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্ষদগণের মন্তব্য সে প্রদীপ্ত রোষানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল।

হরচন্দ্র কহিলেন,—"দেখ্‌লেন—তাঁর অভাব কোথায়? আপনার কাছে কিছুখানা বাগাবার উদ্দেশ্যেই আসা হয়েছিল। আপনি বড় বিচক্ষণ, তাই এখানে কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না।"

নরচন্দ্র কহিলেন,—"টাকায় কিছু বাগাতে পার্‌লেন্ না বটে;

কিন্তু অপমানের চরম কর্‌লেন। আপনি বাল্যবিবাহ-নিবারিণী-সভার সভাপতি, আর আপনার ঘরে বাল্যবিবাহ হ'য়ে গেল। কি ক'রে যে আপনি লোকালয়ে মুখ দেখাবেন, আমি তো ভেবেই পাই-নে! সংবাদ-পত্রে যদি এই সকল কথা প্রকাশ পায়!"

রমণীমোহন লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল,—'যে সহোদর এমন করিয়া তাঁহার অপমান করিতে পারে, সে কখনই সহোদর-পদবাচ্য নহে।' সুতরাং তিনি জ্যেষ্ঠের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। দেশে তো আর যাবেনই না; অধিকন্তু বাস্তুভিটার অংশ কোনও মুসলমানকে বিক্রয় করিবেন—সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্ষদগণের মনস্তুষ্টি-বিধানোদ্দেশ্যে কহিলেন,— "আমার নিজেরও তো এক কন্যা আছে! দেখ্‌বেন,—সেই কন্যার বিবাহে আমার প্রতিজ্ঞা কিরূপভাবে প্রতিপালিত হয়! উপযুক্তরূপ লেখাপড়া না শিখাইয়া, উপযুক্তরূপ বয়স্থা না করিয়া, আমি কখনই আমার কন্যার বিবাহ দিব না।"

রমণীমোহনের মন এইরূপ অশান্তিপূর্ণ হইল বটে; কিন্তু যাঁহারা পুত্র-কন্যার বিবাহ দিলেন, শুভবিবাহের পর তাঁহাদের আনন্দ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। সে বৎসর সুবর্ষণ-সুকর্ষণের ফলে ধরণী শস্যশালিনী হইলেন। রামমোহন ও সদানন্দ উভয়েই প্রচুর শস্য-সম্পৎ লাভ করিলেন।

বিবাহের অল্পদিন পরে দুই বৈবাহিকে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, দুই জনেরই প্রফুল্ল বদন। রামমোহন কহিলেন,—"আমি উমার বিবাহে কিছু দিতে পারি নাই, সেজন্য বড় ক্ষুব্ধ ছিলাম। কিন্তু মা-লক্ষ্মী যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এখন কিছু দিবার আকাঙ্ক্ষা করি।" সে কথায় সদানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"বেয়াই! মানুষের দেওয়া দেওয়া নয়, ভগবানের দেওয়াই দেওয়া। দান-পণ হিসাবে আপনি আর আমায় কত দিতেন? কিন্তু দেখুন—ভগবান এবার আমায় আশার অধিক সম্পৎ দান করেছেন। উমা-আমার সত্যই উমা। মা-আমার গৃহে প্রবেশ করার পর হইতে আমার সংসার ধন-ধান্যে পূর্ণ হইয়াছে। বিবাহে বিশেষ কিছু যৌতুক দিতে পারেন নাই বলিয়া আপনি অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আপনার উমা-রূপিণী গৌরী যখন আমার ঘরে আসিয়াছেন, তখনই আমি আশার অধিক সামগ্রী লাভ করিয়াছি। আপাততঃ এ বিষয়ে আপনার উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নাই। আপনার অন্যান্য যে অভাব-অনাটন আছে, এক্ষণে তাহাই দূর করুন।"

কথাবার্ত্তায় এদিন যে আনন্দ প্রকাশ পাইল, যতদিন তাঁহারা জীবিত রহিলেন, ততদিন তাঁহাদের সেই আনন্দ অটুট রহিল।

* * *

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন আসিল। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তন হইল। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর কাটিয়া গেল।

রমণীমোহন এখন কলিকাতায় বদলী হইয়াছেন। শোভা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পড়া পড়িবার চেষ্টা পাইতেছে। এতদিন রমণীমোহনের গর্ব্ব ছিল, তিনি বাল্য-বিবাহের প্রতিকূলতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এখন কন্যার যৌবনোদ্গমে, সুপাত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া, তাঁহাকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছে।

রমণীমোহন সমাজ-সংস্কারক-দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন সত্য; তথাপি, ব্রাহ্মণেতর বর্ণে কন্যা-সম্প্রদান করিতে কেমন একটা যেন সঙ্কোচের ভাব মনোমধ্যে উদিত হইয়া প্রাণটাকে তোলাপাড়া করিয়া তুলিল। স্বসমাজে শোভার উপযুক্ত মনোমত সৎপাত্র খুঁজিয়া মিলিল না। যে দুই-একটী মাঝামাঝি পাত্র নজরে পড়িল, তাহাদের অভিভাবকগণ কন্যার পরিচয় পাইয়াই পিছাইয়া পড়িলেন।

যেখানেই চেষ্টা করেন, সেইখানেই বিফলমনোরথ হন। সুতরাং রমণীমোহন বিষম ভাবনায় পড়িলেন। সর্ব্বদাই ঐ ভাবনা—সর্ব্বদাই ঐ চিন্তা! আপিসে কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে বরং একটু অন্যমনস্ক থাকেন; কিন্তু বাসায় আসিলে, কন্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ, পত্নী সোহাগিনীর মুখে এখন আর কন্যার বিবাহের কথা ভিন্ন অন্য কথাই নাই। স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি কন্যার বিবাহবিষয়ক সহস্র প্রশ্নে তাঁহার কর্ণ পরিপূর্ণ করেন।

রমণীমোহন আজ আপিসে যান নাই। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে নিভৃতে বসিয়া বিদেশের দুই চারি জন বন্ধু-বান্ধবকে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ-বিষয়ে পত্র লিখিতেছেন।

সহসা সোহাগিনী পাগলের ন্যায় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রোষ-ক্ষোভ-বিজড়িত-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! এর চেয়ে মাথায় কেন বজ্র পড়্‌লো না! তুমি আজই যদি এর প্রতিকার কর্‌তে না পার, আমি এখনই বিষ খেয়ে মর্‌বো। তুমি কি ক'রে নিশ্চিন্ত আছ?" সোহাগিনী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

"কেন—কেন?—কি হয়েছে?"

রমণীমোহন শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোহাগিনীর হাত চাপিয়া ধরিলেন।

সোহাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"এখনও জিজ্ঞাসা কর্ছো—কি হয়েছে? হবার আর কি বাকী আছে? এই পড়ে দেখ।"

এই বলিয়া সোহাগিনী রমণীমোহনের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। পত্রখানি—শোভার লেখা।

পত্রের দুই ছত্র পড়িয়াই রমণীমোহন শিহরিয়া উঠিলেন। পত্র—প্রণয়পাত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত। শোভা পত্রে লিখিতেছে,—"প্রাণেশ্বর! তুমি নিশ্চয় জানিও, শোভা তোমারই। বাবা নানা-স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন বটে; কিন্তু আমি তোমারই।"

কি সর্ব্বনাশের কথা! রমণীমোহনের শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল। পত্র হস্তস্খলিত হইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

সোহাগিনী কহিলেন,—"এখন বিচলিত হও কেন? আমি অনেক দিন থেকেই সাবধান করে আস্‌ছি। কিন্তু তুমি, আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; কেবল সমাজ-সংস্কার—সমাজ-সংস্কার বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছ। এখন দেখ—তার ফল!"

এই বলিয়া পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পত্রের আরও কয়েক ছত্র সোহাগিনী পতির চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিলেন। সে কয় ছত্র,—"পিতা স্বসমাজে ব্রাহ্মণের ঘরে পাত্র অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে তুমি জাত্যংশে হীন। সুতরাং তোমার সহিত আমার পরিণয়-সম্পর্কে তিনি ঘোর প্রতিবাদী হইবেন। এমন কি,

তাহাতে আমাদের প্রাণসঙ্কট বিপদ ঘটিতে পারে। এইজন্য আমি স্থির করিয়াছি, পলায়ন করিব। শনিবার অপরাহ্ণে আমি ইডেন-গার্ডেনে বেড়াইতে যাইব। সেই যাওয়াই আমার যাওয়া। সেই সময় তুমি প্রস্তুত থাকিবে। আমি সকলের চোখে ধূলি দিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।"

"কে—কে সে পিশাচ! আমি এখনই তার মুণ্ডচ্ছেদ করিব!"

রমণীমোহন উত্তেজিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া আপনার পিস্তলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সোহাগিনী বাধা দিয়া কহিলেন,—"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! এতে হিতে বিপরীত ফল ফল্‌তে পারে। স্থির হও, ধৈর্য্যধারণ কর। এখন উপায় কি, ভাবিয়া দেখ।"

রমণীমোহন তথাপি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না।

"কে সে?—তার রক্ত দর্শন না ক'রে আমি জল-গ্রহণ কর্‌বো না।"

রমণীমোহন পুনঃপুনঃ আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

সোহাগিনী উত্তর দিলেন,—"কে সে, তা কি তুমি জান না? সেই নাপ্‌তে ছোঁড়া! মহকুমায় থাক্‌বার সময় যাকে প্রাইভেট-টিউটর রেখেছিলে। আমি সেই সময়েই তোমায় সাবধান করি। কিন্তু তুমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই।"

রমণীমোহন বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন,—"সেই ভূতো বেটা? সে বেটা এখানে কোথা থেকে এলো? তার মুণ্ডুটা—"

সোহাগিনী পুনরায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"তার মুণ্ডুটায় আর কাজ নেই। এখন নিজের মুণ্ডুটা বাঁচাবার চেষ্টা কর।"

"এখন উপায় কি?"

রমণীমোহন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সোহাগিনী।—"উপায় আর আছে ছাই! তবে এক উপায়—আর বাড়ীর বাহির হইতে না দেওয়া। অন্য উপায়—যেমন পাত্রেই হউক, শীঘ্র বিবাহ দেওয়া।"

"আচ্ছা, তাই হবে!"

রমণীমোহন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"দেখা যাবে, কেমন আর বাড়ীর বা'র হয়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিয়া শোভা পুস্তকগুলি আলোড়ন করিল। তন্ন তন্ন করিয়া প্রতি গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল। কিন্তু পত্রখানি খুঁজিয়া পাইল না। মন বিষম সংশয়-সন্দেহে আন্দোলিত হইল।

"তবে কি ডাকে পাঠাইয়াছি? না—না—কৈ, তা তো মনে হয় না!" আবার খুঁজিল। পত্র মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা আসিয়া কহিলেন,—"দেখ্ শোভা! তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। কালীঘাটে তাঁদের বাড়ী। কাল্ তাঁরা আশীর্ব্বাদ কর্‌তে আস্‌বেন। এখন আর তুই কদাচ বাড়ীর বা'র হস্-নে। অনেক সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে। এটা কোনও রকমে ভেঙ্গে না যায়!"

শোভা নতমুখে নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

পিতা আরও কহিলেন,—"পাত্রটী সদ্বংশজাত। আমাদেরই স্বশ্রেণীভুক্ত। যদিও দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স বেশী হয় নাই। যজমানী কাজে তাঁদের দু'পয়সা বেশ সংস্থানও আছে।"

শোভার আপাদ-মস্তক যেন জ্বলিয়া উঠিল। শোভার মনে হইল,—সে স্পষ্টই কোনও উত্তর দেয়—বিবাহে অমত প্রকাশ করে। কিন্তু রমণীমোহন অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। কথাগুলি বলিয়াই তিনি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে, শোভার প্রাণ উদ্বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শোভার শঙ্কা হইল—"তবে কি পত্রখানা পিতার হাতে পড়িয়াছে! তা না পড়িলে, পিতা আমায় বাহিরে যাইতে নিষেধ করিবেন কেন?"

শোভার প্রাণে নানা চিন্তা নানা ভাবনা আসিয়া উদয় হইল। শোভা মনে মনে কহিল,—"আমি একবার যাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন আমার অধিকারী অন্য কেহ হইতে পারে না। জাতি!—জাতি আবার কি? পিতারই কথার ঠিক নাই দেখিতেছি। তিনি কতদিন কত সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—'জাতি আবার কি? ঈশ্বরের সৃষ্ট মনুষ্য সব সমান।' তবে আবার তিনি কেন জাতির কথা তুলেন? যিনিই যাহা বলুন, আমি কাহারও কথা শুনিব না। বাড়ীর বাহির হইতে দিবে না? না দেয়, এই ভাবেই আরাধ্য-ধনের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিব।"

পরদিন কালীঘাটের পাত্র স্বয়ং আসিয়া শোভাকে দেখিয়া গেলেন। শোভা দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিল—আপত্তি জানাইয়া-

ছিল ; কিন্তু পিতামাতার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তাহাকে দেখা দিতে হইল।

দেখা দিয়া বা দেখিয়া আসিয়া, শোভা অধিকতর চঞ্চল হইয়া পড়িল। "পিতা এই পাত্রের সহিত আমার বিবাহ দিতে চান্? হনুমনের মত চেহারা! অসভ্যের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী—শিখা-পুচ্ছধারী—এই মূর্খ পাত্রকে আমি বিবাহ করিব! কখনই নয়! মরণ শ্রেয়ঃ ; তথাপি যেন এ পাত্রের হস্তে না পড়িতে হয়।"

শোভার সঙ্কল্প ছিল—পলাইয়া যাইবে। কিন্তু পলায়ন অসাধ্য হইল। পিতামাতার খরদৃষ্টি শোভাকে আর বাড়ীর বাহির হইতে দিল না।

বিষম অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। যাহাকে শোভা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে নানা চিন্তা শোভার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। শোভা আপন মনে অনেক বিচার-বিতর্ক করিয়া দেখিল। দেখিয়া বুঝিল—ইহজীবনে আর তাহার সুখ-শান্তি নাই। আরও বুঝিল—ইহজীবনে আপন প্রণয়পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর সম্ভাবনাও নাই।

শোভা মনে মনে ডাকিল,—"নাথ! প্রাণেশ্বর! এ জীবনে বুঝি আর তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম না! কিন্তু তোমায় ধ্যান করিতে করিতে, উদ্দেশে তোমায় আলিঙ্গন করিতে করিতে, তোমার শোভা ইহজগৎ পরিত্যাগ করিল।"

উপসংহার।

গভীর-রাত্রি। সহসা পুরী মুখরিত হইয়া উঠিল—আগুন! —আগুন! প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসিল। পুলিশ-প্রহরীরাও আসিয়া সমবেত হইল। দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, সকলে দেখিল,—শোভার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতেছে, শোভা ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রকোষ্ঠের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শোভার গাত্রনিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রকোষ্ঠের আস্‌বাব পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। শোভা মনের ক্ষোভে আগুন জ্বালিয়া পুড়িয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছে।

শোভার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া জনক জননী উভয়েই সে আগুন নিবাইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানে অনেকক্ষণ কাহারও সাহসে কুলাইল না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই শোভা লুটাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্রন্দনের রোলে পুরী কাঁপিয়া উঠিল।

রমণীমোহন উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতে লাগিলেন। সোহাগিনী বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"তোমারই বুদ্ধির দোষে এই সর্ব্বনাশ হইল।"

তখন কত পুরাতন কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল—জ্যেষ্ঠ রামমোহনের গৌরী-দানের ফল; মনে পড়িল,—উমার সুখ-সমৃদ্ধির বিষয়। মনে পড়িল—শোভাকে বয়স্থা করিয়া রাখায় জ্যেষ্ঠের আপত্তির কথা; মনে পড়িল—তজ্জন্য তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার। অনুশোচনায় পতি-পত্নী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

অলঙ্কার।

——: ‡*‡ :——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

যদুপতির অনেক দিনের সাধ,—স্ত্রীর গহনাগুলি গড়াইয়া দিবেন। দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি, সময়ে সময়ে, সেই চিন্তা প্রায়ই তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয়।

যদুপতির পিতা শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যজন-যাজন প্রভৃতির দ্বারা তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু পুত্র যদুপতিকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য তাঁহার বড়ই সাধ হয়। তাই ব্রাহ্মণ, যদুপতিকে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি কায়ঃক্লেশে মাসে মাসে ব্রাহ্মণ চারিটি করিয়া টাকা পুত্রের পড়িবার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। যদুপতি বাল্যাবধি কষ্টসহিষ্ণু ও সুবোধ-প্রকৃতি। পিতার অবস্থা সকলই তো তিনি বুঝিতেন! সুতরাং যদুপতি, সেই চারিটি মাত্র টাকা

উপলক্ষ লইয়া কলিকাতায় আসিয়া, একটী বাড়ীর দুইটী বালককে "প্রাইভেট" পড়াইবার যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। যে বাড়ীতে তিনি "প্রাইভেট" পড়াইতেন, সেই বাড়ীতেই তাঁহার আহারাদির ও অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তবে সে গৃহস্বামী কায়স্থ; বিশেষতঃ, তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পাচকের ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং যদুপতিকে আপনার জন্য স্বপাকে রন্ধন করিয়া লইতে হইত। দুইটি বালকের পড়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট নিত্য-নূতন পাঠ অভ্যাস করিয়া যাওয়া, অধিকন্তু আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া লওয়া,—কতদূর আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায়, প্রথমোক্ত দ্বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, যদুপতি প্রায়ই শেষোক্ত কার্য্যে—রন্ধন ব্যাপারে, অক্ষম হইতেন। প্রায়ই তাঁহার অদৃষ্টে দু'বেলা অন্নাহার জুটিত না; কখনও বা একবেলা রাঁধিয়া দু'বেলা খাইতেন; কখনও বা 'জলটল' খাইয়াই দিন-যাপন করিতেন।

এইরূপ কষ্টে দিনপাত হয়। এমন সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণ প্রায় ছয় মাস কাল শয্যাশায়ী ছিলেন। পল্লী-গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে টাকা-কড়ি বা আর কতই থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, যদুপতির পিতা তো কখনও ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না! সুতরাং তাঁহার পীড়ার চিকিৎসায়, সাংসারিক নানা ব্যয়-

বাহুল্যে, অধিকন্তু তাঁহার সৎকার-শ্রাদ্ধাদিতে, সংসার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যদুপতির জননী কাত্যায়নী দেবীর হাতে টাকা-কড়ি সামান্য যাহা কিছু ছিল এবং তাঁহার গায়ের গহনা-পত্র সমস্তই এই উপলক্ষে নিঃশেষ হইয়া যায়।

পিতার পরলোক-গমনের সময় যদুপতির বয়ঃক্রম অষ্টাদশ-বর্ষ মাত্র। সেবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যদুপতি যে চারিটি টাকা মাত্র বাড়ী হইতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও পুস্তকাদি ক্রয়ের ব্যয়ই কুলান হইত না। বিদ্যালয়ে তিনি অর্দ্ধেক বেতনে পড়িতে পাইতেন; সেই চারি টাকার মধ্য হইতে সে বেতনও তাঁহাকে দিতে হইত। এই অবস্থায়, পিতার ব্যায়রামের সময়, তিন মাস কাল, যদুপতি সেই চারি টাকা সাহায্যেও বঞ্চিত হন; বন্ধুবান্ধবের নিকট ঋণ করিয়া কোনরূপে সে খরচ চালাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাবে আর কয় দিন চলিবে? পরীক্ষার আরও তিন মাস সময় অবশিষ্ট আছে। সে তিন মাসই বা কেমন করিয়া কাটিবে? বিশেষতঃ, পরীক্ষার পূর্ব্বে একসঙ্গে আবার অনেকগুলি নগদ টাকার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার "ফিজের" টাকা আছে; অগ্রিম তিন মাসের বেতন দেওয়া আছে;—সে সকল টাকাই বা কি করিয়া সঙ্কুলান হইবে? যদুপতি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন। পিতার মৃত্যুর সময় বাড়ী আসিয়া তাঁহার আদ্যকৃত্যের

পর সাংসারিক অবস্থা দর্শন করিয়া, যদুপতির ভাবনা আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। তবে কি যদুপতির লেখা পড়া বন্ধ হইবে? এতদূর অগ্রসর হইয়াও তবে কি পরীক্ষা পর্য্যন্তও সামর্থ্যে কুলাইবে না? যদুপতি জননীর নিকট প্রায়ই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যদুপতির পিতা, চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যদুপতির বিবাহ দিয়াছিলেন। চারি কন্যার পর তাঁহাদের এক পুত্র যদুপতি। তাহার পরও তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিবেন,—অনেক দিন হইতে শঙ্করনাথ ও কাত্যায়নীর মনে সে বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত ঘর-মেল না মিলায়, সর্ব্বসুলক্ষণা সুন্দরী পাত্রী না পাওয়ায়, অনেক দিন পর্য্যন্ত, তাঁহাদের মনের বাসনা মনেই আবদ্ধ ছিল। অবশেষে, অনেক সন্ধান-সুলভের পর, চন্দন-গ্রামের ৺বিশ্বরাম তর্কবাগীশের পৌত্রী কমলার সহিত যদুপতির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করনাথ, যদুপতির বিবাহ দিয়া কমলাকে গৃহে আনয়ন করেন। বিবাহের সময় কমলার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। বিবাহের পর কমলা দুই তিন বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। শঙ্করনাথের পীড়ার সময় কমলাকে যে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত কমলা শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করিতেছে। যদুপতি পিতৃকার্য্য উপলক্ষে বাড়ী আসিয়া অবধি এবার বরাবরই কমলাকে দেখিতে পাইতেছেন।

যদুপতির পড়াশুনা-সম্বন্ধে তাঁহার জননীর সহিত যে কথাবার্ত্তা হইত, কমলা প্রায়ই তাহা শুনিতে পাইত। সেই সকল কথা শুনিত, আর কমলা মনে মনে কত-কি কল্পনা করিত। কল্পনা বশে কখনও কখনও তাহার মনে হইত,—"আমার গায়ের দুই একখানা গহনা বিক্রয় করিলে তাঁহার পড়ার ব্যয় কুলান হইতে পারে না কি ?" কিন্তু অনেক সময় কমলার সে মনের কল্পনা মনেই বিলীন হইত। মুখ ফুটিয়া তো কিছু কহিতে পারিত না! সংসারে প্রতিদিনই সেই কথার আলোচনা হয়। প্রতিদিনই হতাশের বিষাদের নূতন নূতন লাঞ্ছনা-সম্পাতে যদুপতির মুখ-শ্রী মলিন-ভাব ধারণ করে। প্রতিদিনই কমলা সেই কথা শুনিতে পায়, প্রতিদিনই কমলা সেই দৃশ্য দেখিয়া থাকে; প্রতিদিনই কমলা সেই ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়ে। কমলার কমল-হৃদয়ে তখন আন্দোলনের অবধি থাকে না। স্থিরশান্ত সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার গর্ভে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া, জল-কর্দ্দম-ধাতুনিঃস্রব প্রভৃতি নির্গত হয়। কমলার প্রাণের ভিতর যে চিন্তানল জ্বলিয়া উঠিল, যে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহাই বা সহজে নিবৃত্ত হইবে কি প্রকারে ? কমলা চাপিয়া চাপিয়াও চাপিতে পারিল না। শেষ একদিন, মধ্যমা ননদিনীকে প্রাণের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিল। মাকে (শাশুড়ীকে) অনুরোধ জানাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

বুঝাইল,—"দেখ দিদি! গহনা কত হইতে পারে! কিন্তু পড়ার সময় এই দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেলে, সে সময় কি আর কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে?" এই বুঝাইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, কমলা ননদিনীর দ্বারা শাশুড়ীর নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিল।

কাত্যায়নী, কন্যার মুখে সেই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া, প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন; পরে নানারূপ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষ, আপনার অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিয়া, আপনা-আপনিই বিলাপ করিয়া কহিলেন,—"হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল! সোণার-কমল শিশুর অঙ্গ হ'তে সোণার পাপড়ী গহনাগুলি ছিঁড়ে নিতে হ'ল!" কিন্তু না লইলেও আর উপায় নাই! ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা চিরতরে লোপ পায়! কাত্যায়নী মনে মনে ডাকিলেন,—"মা কাত্যায়নী! অভাগিনীর অপরাধ লইও না। যদুপতির ও কমলার মুখ চাহিয়া, তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়াই, আমায় এই পিশাচ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল!" কাত্যায়নী আরও প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা গো! কমলার অলঙ্কার-মোচন যেন সার্থক হয়। বিদ্যার্জ্জনের পর ধনোপার্জ্জনে যদুপতি যেন কমলাকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা করিতে সমর্থ হয়। তবেই মা, আমার এ ক্ষোভ কতক মিটিতে পারিবে।"

শাশুড়ীর এতাদৃশ 'মৌনে সম্মতি লক্ষণ' বুঝিতে পারিয়া, কমলা, আপন গলার সোণার হার-ছড়াটি খুলিয়া লইয়া, তাঁহার চরণতলে উপনীত হইল; অতি ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র-বচনে কহিল,—"মা! আপনি মনে কোনরূপ সঙ্কোচ করবেন না। গহনা আবার হবে! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোনও ক্ষোভ থাক্‌বে না।" একান্ত অনিচ্ছায়, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, দারুণ আত্মগ্লানি চাপিয়া রাখিয়া, কাত্যায়নী কমলার গলার হারটী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সোণার হারটী পাড়ার একজন স্ত্রীলোকের নিকট বন্ধক দেওয়া হইল। রায়-গৃহিণী হার বন্ধক দিয়া "সাড়ে সতের গণ্ডা" টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিল। সেই টাকার মধ্য হইতে ৫০৲ পঞ্চাশটী টাকা যদুপতি কলিকাতায় লইয়া গেলেন; অবশিষ্ট কুড়ি টাকা সংসারের খুচরা দেনা-পত্র মিটাইবার জন্য দেওয়া হইল।

ইহাই সূত্রপাত। ইহার পর কমলার গায়ে আরও যে যে গহনা ছিল, সংসারের দৈন্য-দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া, বিশেষতঃ যদুপতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার "এলে" পড়ার পুস্তকাদি ক্রয়-জন্য, সেগুলিও একে একে কমলা গা হইতে খুলিয়া দিয়াছিল। তার পর গহনা বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের যাহা অবশ্য-ম্ভাবী ফল, তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই বন্ধকের অল্প টাকাতেই সুদে সুদে গহনাগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

যদুপতি সকল ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনাগুলি পরতে পরতে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে সজ্জিত ছিল। উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি, সেগুলি যেন এক একবার প্রাণটাকে আলোড়ন করিত। সঙ্গে সঙ্গে যদুপতির মনের মধ্যে কতই পুরাতন স্মৃতি ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার মনে হইত,—কিশোরী কমলা বধূবেশে ঘরে আসিয়া, সংসারের দৈন্য-দারিদ্র্যে অভিভূত হইয়া, কেমনভাবে হাসি-হাসি-মুখে একে একে গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছিল! আর মনে হইত,—বালিকা বধূর গহনা বিক্রয়ের অর্থে কেমন করিয়া তাঁহার সংসার চলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাঁহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহ হইয়াছিল!

ক্ষুদ্র একটী যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তার পর দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আর সেই দীর্ঘ-কালে—সংসারের কত পরিবর্ত্তনই না সাধিত হইয়াছে! যদুপতি উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছেন। জননী কাত্যায়নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটী ভগিনী বিধবা হইয়া পুত্রকন্যাসহ যদুপতির আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। কিশোরী কমলা, প্রৌঢ়া গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ক্রোড়ে সোণার কমল দুইটী পুত্রসন্তান শোভা পাইতেছে। সংসারের দেনা-পত্র সমস্তই পরিশোধ হইয়াছে। বাড়ী-ঘরের শ্রীছাঁদ ফিরিয়াছে। যদুপতি দেশের গণ্য দশের মান্য হইয়াছেন।

সকলই হইয়াছে; কিন্তু হয় নাই—কমলার অলঙ্কারগুলি! তাহাতে যদুপতিরও তত দোষ নাই। কমলাই ইচ্ছা করিয়া যেন সে পক্ষে উদাসীন আছে। গহনার কথা উঠিলে, কমলা এ পর্য্যন্ত কেবলই বলিয়া আসিয়াছে,—“সে জন্য ভাবনা কেন? আগে দেনা পত্র শোধ যাক, আগে বাড়ী-ঘর প্রস্তুত হউক, আগে অন্যান্য অভাব মোচন করুন; তার পর আমার গহনা আমায় দিলেই হইবে।”

যদুপতির হৃদয় কি যেন এক নূতন উপাদানে বিগঠিত। বাল্যকালে তিনি বড় কষ্টই পাইয়াছেন। অন্যের সামান্য কষ্ট দেখিলে, তাই তাঁহার প্রাণটা অতি কাতর হইয়া উঠে। পরের কষ্টমোচনে তিনি যেন সদাই মুক্তহস্ত। আর তজ্জন্য, তাঁহার হাত প্রায়ই শূন্য হয়। নচেৎ, অন্য প্রকৃতির লোক হইলে, এতদিন কি তিনি স্ত্রীর গহনাগুলি গড়াইয়া দিতে পারিতেন না? যাহা হউক, এবার তাঁহার একান্ত বাসনা,—কমলার অলঙ্কারগুলি কলিকাতা হইতে গড়াইয়া আনিবেন!—৺ মহাপূজায় বাড়ী আসিবার সময় গহনাগুলি সঙ্গে আনিয়া কমলাকে নূতন সাজে সাজাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— * ——

যদুপতির মাসিক উপার্জ্জন তিন শত টাকার কম নহে। অথচ, এ পর্য্যন্ত তিনি স্ত্রীর গহনা কয়খানি গড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, লোকে ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে পারে না কি?

তবে কি যদুপতির কোনও অপব্যয় আছে? তবে কি যদুপতির চরিত্রগত কোনও দোষ জন্মিয়াছে? যাহারা তাঁহার আয়-ব্যয়ের গূঢ়তত্ত্ব অবগত নহে, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দূর হইতে বাহিরে বাহিরেই যাহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, অথবা অপরের ছিদ্রান্বেষণই যাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত আছে,—তাহাদের মনে কত কথাই কত সময় উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে যাঁহারা অগ্রসর হন, যদুপতির আচারে-ব্যবহারে চলনে চরিত্রে তাঁহারা কি চিত্র দেখিতে পান?

যদুপতির কলিকাতার বাসাটিকে একটী ক্ষুদ্র অন্নসত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বাস-গ্রামের দশ ক্রোশ

ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম-সমূহের অধিবাসীদের, যাহারই যখন কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হয়, যদুপতির বাসা তাঁহারই সংবর্দ্ধনার জন্য যেন নিয়ত বাহু প্রসারণ করিয়া আছে। বিশেষতঃ বিদ্যার্থী দরিদ্র বালক, কলিকাতার কোথাও আশ্রয় না পাইলে, যদুপতির বাসায় তাহার আশ্রয় আছেই আছে। যদুপতির বাসার মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিলে, 'মেছের' বাসা বা ছাত্রাবাস বলিয়া ভ্রম হয়। উপরে নীচে সকল ঘরে সারি-সারি বিছানা পাতা। প্রতি বিছানায় মাথার দিকে অল্প-বিস্তর পুস্তকের স্তূপ। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র এক-একটী টীনের বাক্স; কোথাও কোথাও তৎপরিবর্ত্তে মাথার ধারে কাপড়ের পুঁটুলি। প্রতি শয্যাপার্শ্বে এক-একটী মাটীর প্রস্থজের উপর তেলের প্রদীপ। বাসার কি অপরূপ শোভা হয় সন্ধ্যার সময়,—যখন বালকের দল, আপন-আপন প্রদীপটী জ্বালিয়া আপন আপন শয্যার উপর বসিয়া, আপন-আপন পুস্তক খুলিয়া, তন্ময় হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদুপতির উপার্জ্জনের অনেক অংশই এই বাসার ব্যয়-নির্ব্বাহে, দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিপালনে, ব্যয়িত হইয়া থাকে।

যদুপতির ঠাকুরদাদা-সম্পর্কীয় জনৈক হিতৈষী আত্মীয়, তাঁহার এই ব্যয়-বাহুল্য দর্শন করিয়া, মিষ্ট-উপদেশ-ছলে একবার তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,—"এমন করিয়া অপব্যয় করিলে,

কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়। কিন্তু তোমার তো এই সামান্য কয়টি টাকা আয়! মনে কর দেখি,—তুমি যদি কখনও ব্যায়রাম হইয়া পড়িয়া থাক, তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা কি হইবে? সেরূপ অবস্থায়, তোমারই বা চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা কে করিবে? কিন্তু যদুপতি তাহাতে মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া বিনীত-স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন,—"ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি মনে করি, সকলই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ! আমার মনে হয়, আমার যে দুই পয়সা আয়-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও ঐ দরিদ্র ছাত্রদিগের অদৃষ্ট-গুণে! মনে করুন,—যদি আমার উপার্জ্জনের পথ চির-রুদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেই বা আমার ও আমার পুত্র-পরিবারের কি দশা ঘটিত! ভগবান যে আমায় তেমন দৈন্য-দশায় রাখেন নাই; ইহাই তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। আর সে অনুগ্রহের মূল কারণ, আমার মনে হয়, ঐ দরিদ্র ছাত্রদিগের আশীর্ব্বাদ!" যদুপতির এই উত্তরে তাঁহার হিতৈষী আত্মীয় কিন্তু বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"চিরদিন এ চাল বজায় রাখিতে পার, ভালই! তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন তো আমি কখনও অমঙ্গলের কামনা করি না। তোমার বাল্যকালে তোমার মা ও তুমি বড় কষ্ট পেয়েছিলে। বার্দ্ধক্যে আর তোমাকে সে কষ্ট না পেতে হয়, তাই কিছু সঞ্চয়ের জন্য এ

সব বলে থাকি। শোন, ভালই; না শোন, নিজেরই আপ্‌শোষ হবে।" যদুপতি আত্মীয়ের মনস্তুষ্টির জন্য তদনুরূপ উত্তর দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; মনে ভাবিয়াছিলেন,—"বলি না কেন—'আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে উত্তর কোনক্রমেই বাহির করিতে পারেন নাই। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, যাতনার কি যেন এক তীব্র তাপ, তাঁহার প্রাণের ভিতর উদ্ভূত হইয়া, সে চিন্তাস্রোত শোষণ করিয়া লইয়াছিল। যদুপতির মনে তখন নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"আমি বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। পঠদ্দশায়, পুস্তকের অভাবে, বেতনের অভাবে, অন্নের অভাবে, দরিদ্র বালকেরা যে যন্ত্রণা ভোগ করে, আমি হাড়ে হাড়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমি যদি সে যন্ত্রণার গুরুত্ব ও ভীষণতা উপলব্ধি করিতে না পারিব, তবে কে তাহা উপলব্ধি করিবে! আমি যদি তাহাদের সে কষ্ট দূর করিবার জন্য চেষ্টা না পাইব, সে চেষ্টা তবে কে পাইবে! যাহারা চিরসুখক্রোড়ে লালিত পালিত বৰ্দ্ধিত, সে যন্ত্রণা তাহারা কি বুঝিবে!" যদুপতির প্রাণের ভিতর তখন যেন পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল,—"দরিদ্র বালকের পঠদ্দশার কষ্ট আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি; সে কষ্ট আমি যতদূর উপলব্ধি করি, চিরসুখমগ্ন ধনিসন্তানেরা তাহা কিরূপে উপলব্ধি করিতে

পারিবেন ?” এই সূত্রে কবি-কৃষ্ণচন্দ্রের সেই কবিতা-পংক্তিচয়, যদুপতির মানসপটে স্বতঃই প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—

“চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥”

যদুপতির আরও মনে হইতে লাগিল,—“পঠদ্দশায়, দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া, কত সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—‘ভগবান যদি কখনও আমায় দিন দেন, আমি দরিদ্র বালকের পঠদ্দশার কষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইব।’ ভগবান এখন আমার সে প্রার্থনা শুনিয়াছেন; অনুকম্পা-প্রদর্শনে আমার সে দৈন্য-দশার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমি আমার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি কি ? আমি বড় কষ্ট পাইয়া বড় কাতরতায় ভগবানকে ডাকিয়াছিলাম। এখন যদি আমি প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হই, নরকেও যে আমার স্থান হইবে না!” আত্মীয়, আশানুরূপ উত্তর না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যদুপতির প্রাণের ভিতর এই চিন্তা-প্রবাহ প্রবহমান ছিল।

যদুপতির বাসায় এতগুলি ছাত্র এরূপভাবে প্রতিপালিত হয়, অথচ তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্ম-প্রশংসার ঢক্কা-নিনাদে কাহারও কর্ণপটহ কদাচ প্রতিধ্বনিত হয় না। সংবাদপত্রেও কথনও সে কথার কোনও আলোচনা দেখা যায় না; লোকমুখেও সে সংবাদ ততদূর প্রচারিত নহে। নীরবে ধীরভাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-বোধে যদুপতি নিরন্ন বালকদিগকে অন্নদান করেন; নীরবে ধীরভাবে বায়ু-প্রবাহের মধ্য দিয়া আপনা-আপনিই সে সংবাদ ভগবানের নিকট সংবাহিত হয়; নীরবে ধীরভাবে বালকদিগের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদুপতির মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইয়া থাকে।

বাসার যে ঘরটিতে যদুপতি অবস্থান করেন, সে ঘরটি দ্বিতলের এক পার্শ্বে অবস্থিত। ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র নহে; কিন্তু ঘরের এক পার্শ্বে একখানি তক্তাপোষে তাঁহার সামান্ত একটি বিছানা, আর চারিদিকেই রাশি রাশি পুস্তকের সমাবেশ! পুস্তকে যেন ঘরটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, লাটিন,—কত ভাষারই কত প্রকার গ্রন্থ! সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব,—সকলেরই যেন সাররত্ন সে প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত আছে! নিরন্ন দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিপালনে যদুপতির যেরূপ যত্ন, বিবিধ ভাষার বিবিধ প্রকারের পুস্তকাদি সংগ্রহেও তাঁহার তদ্রূপ আগ্রহ। এক দিকে যেমন বিদ্যার্থী কোনও দরিদ্র বালক

আসিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হয় না; অন্যদিকে আবার, কোনও দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ উপাদেয় গ্রন্থ বিক্রয় করিতে আসিয়া, কোনও "হকার" কখনও তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। যদুপতির জীবনের এ দুটি যেন এক বিশেষত্ব লক্ষণ! রাশি রাশি পুস্তক-ক্রয়-সম্বন্ধে একবার তাঁহার কোনও আত্মীয় তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,—"রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিয়া কতকগুলা পুস্তক কিনিয়া কি ফল হইতেছে? পড়িয়া জ্ঞানলাভ তো দূরের কথা, অত পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেও যে জীবনে কুলাইবে না! আর দিন কতক পরে ও-গুলা উই ও ইঁদুরের আশ্রয়-স্থল হইবে বৈ তো নয়!" কিন্তু যদুপতি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"পুস্তক-রাশির মধ্যে বসিয়া থাকিলেও, জ্ঞানলাভ আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। সৎসঙ্গে বসবাস করিলে যেমন সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানাধার গ্রন্থরাজির মধ্যে অবস্থিতি করিলেও তদ্রূপ জ্ঞান-সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা।"

যদুপতি কীটের ন্যায় গ্রন্থপত্র মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার জীবিকার পক্ষেও তাহা সহায়ক হইয়াছিল। কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে যদুপতি অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেজন্যও তাঁহার বিদ্যা-চর্চ্চার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন জন্যও,- যদুপতির গ্রন্থ-পাঠের—

বিদ্যালোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলতঃ, যে কারণেই হউক, অধ্যয়নে তাঁহার কদাচ বিরতি ছিল না। স্কুলের চাকরীতে যদুপতি বেতন পাইতেন—দেড় শত টাকা। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থাদিতেও তাঁহার আয় ছিল—প্রায় দেড় শত টাকা। কখনও কখনও সে আয় কিছু বাড়িত বটে; কিন্তু ব্যয়—কলিকাতার বাসায়, ব্যয়—পুস্তকাদি ক্রয়ে, ব্যয়—দেশের বৃহৎ সংসার-প্রতিপালনে। তার পর পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো, তাঁহার উপর আরও কত ব্যয়-ভারই চাপান ছিল! তাঁহাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি পাইতে হইয়াছে; তাঁহাকে পৈত্রিক বাস্তুভিটায় বাড়ীঘর করিতে হইয়াছে; জননী কাত্যায়নীর আদ্য-শ্রাদ্ধে এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহেও তাঁহার কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। একা মানুষ—একা উপার্জ্জনক্ষম; অথচ, ব্যয় নানাদিকে! তিনি কত দিক দেখিবেন? সুতরাং চেষ্টার উপর চেষ্টা করিয়াও, আজি দশ বৎসরের মধ্যে, কমলার গহনা কয়খানি তিনি গড়াইয়া দিতে পারেন নাই। যে বারই ভাবিয়াছেন,—"এইবার গহনাগুলি গড়াইয়া দিব; সেই বারই একটা-না-একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যেমন লক্ষ্মী, তেমনি জনার্দ্দন। যেমন যদুপতি, তেমনি তাঁহার স্ত্রী কমলাসুন্দরী। নচেৎ, মাসে মাসে যদুপতি বাড়ীতে যে সংসার-খরচের টাকা পাঠাইয়া দেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া কমলা কি আপনার গহনা-কয়খানা ক্রমশঃ গড়াইয়া লইতে পারিতেন না? সংসারের সকলেই এইরূপে দুই পয়সা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে! কিন্তু কমলার কি যেন কি বিপরীত প্রকৃতি! সঞ্চয় দূরে থাক, কমলা যেন আবশ্যকানুরূপ ব্যয়-নির্ব্বাহেই কুলান করিতে পারেন না। কেহ কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—"পুত্র, কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়, চাকর, চাকরাণী প্রভৃতিতে যদুপতির সংসারে তো পোষ্য-প্রতিপাল্যের কমি নাই! কমলা কুলাইবেই বা কি করিয়া?" কিন্তু অন্য পক্ষ তাহাতে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন,—"পল্লীগ্রামের সংসারে, একটী পরিবারের মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে আর কত ব্যয় পড়ে? বিশেষতঃ, দুই দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও জোত-জমাও তো আছে!

আরও, যদুপতি, সত্তর, পঁচাত্তর, কোনও কোনও মাসে আবশ্যক বুঝিয়া এক শত টাকা পর্য্যন্ত সংসার-খরচের জন্য পাঠাইয়া থাকেন। তবে কমলা বাঁচাইতে না পারিবেন কেন?"

নানা লোকের নানারূপ সিদ্ধান্তে চিত্ত বিভ্রান্ত করিবার আবশ্যক কি? কমলার সংসারে কিসে কি ব্যয় হয়, একবার সন্ধান লইলেই তো গোল চুকিয়া যায়! আজ চৈত্র-সংক্রান্তি! ঐ দেখুন, যদুপতির বাড়ীতে—নন্দনপুরে—কলসী-উৎসর্গের কি ধূম পড়িয়া গিয়াছে! আরও দেখুন, বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনেরই বা কি বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। কাল সূর্য্যোদয়ে পুণ্যাহ বৈশাখ মাসের আবির্ভাব হইবে; ঐ দেখুন, কমলা জলদানের ফলদানের ব্রতগ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন;—সারা মাস সেই ব্রতের অনুষ্ঠান-পরম্পরা চলিতে থাকিবে। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, কমলার অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত আছে। এই-রূপ জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ়ে মনোরথ দ্বিতীয়া, শ্রাবণে শীতলা সপ্তমী, ভাদ্রে অনন্তচতুর্দ্দশী, আশ্বিনে বীরাষ্টমী,—কমলার বার-ব্রতের অবধি আছে কি? কমলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের দুহিতা, কমলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে পরিণীতা;—কমলা যদি এ সকল বারব্রতের অনুষ্ঠান না করিবে, তবে আর কে তাহা করিবে? কমলা তাই মনে করে,—পূর্ব্বজন্মের পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে সে যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সে যদি এ সকল ধর্ম্মকর্ম্মের

প্রতিপালন না করিবে, তবে কাহার জন্য সে সকল বিহিত হইয়াছে? কমলা প্রায় সকল ব্রতই গ্রহণ করিয়াছে; তাহার কোনও ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে;—কোনও ব্রত বা উদ্‌যাপনের জন্য সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সত্য বটে, কমলা উপবাস করিতে কাতর নহে; সত্য বটে, কমলা কষ্ট সহিতে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু কমলা যে বার-ব্রতে দান-ধর্ম্মে মুক্তহস্ত, তাহা সম্পন্ন করিয়া অর্থ-সঞ্চয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবে কোথা হইতে?

অর্থসঞ্চয়ে কমলার আর এক অন্তরায়,—কমলার আত্মপর ভেদ-জ্ঞান বড়ই অল্প। কেবল আপনার সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া কমলা তো নিশ্চিন্ত হইতে পারে না! সে যখন শুনিতে পায়,—ছিদাম বাগ্দী তাহার 'অথর্ব্ব' বুড়ী-মাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আর বুড়ীটা রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতেছে; তখনই সে ছিদামের মার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ছিদামকে ডাকিয়া, বুঝাইয়াই হউক, অথবা দু'পয়সা সাহায্য দিয়াই হউক,—কমলা, বুড়ীর ব্যবস্থা না করিয়া কোনক্রমেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। এক বার সামান্য তিন টাকা তের আনা খাজনার জন্য, পত্তনিদারের তিন জন পাইক আসিয়া প্রতিবাসী মধুদাসকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়াছিল, জুতা লাথি মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার নাকেমুখে থুতু দিতে এবং তাহার স্ত্রীকে বে-ইজ্জত করিতে

উদ্যোগী হইয়াছিল। সেবার, মধুদাসের স্ত্রী থাকমণি, আতঙ্কে বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া, কমলার পা-দুখানি জড়াইয়া ধরে; কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা জানায়,—"মাগো আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। আমার স্বামীরে বাঁচাও!" আরও মর্ম্মভেদী স্বরে বলে,—"যমদূতেরা এতক্ষণ বোধ হয় তাঁকে খুন করে ফেল্‌লে! আপনি না বাঁচালে, আমাদের বাঁচাবার আর কে আছে,—বলুন!" কমলা, সেবার লোক পাঠাইয়া, পত্তনিদারের প্রাপ্য গণ্ডা চুকাইয়া দিয়া মধুদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু, সেই সমস্ত ব্যাপার যদুপতিকে জানাইয়া অত্যাচারের প্রতিকার-উপায় নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তদবধি, যদুপতির বাসগ্রাম নন্দনপুর, যদুপতি নিজেই পত্তনি গ্রহণ করিয়াছেন; কমলার প্রতি গ্রামের দীন-দুঃখী প্রজাগণের আশীর্ব্বাদের আর অবধি নাই।

কমলার আর এক গুণ,—কমলা পরসেবায় কখনও কাতর নহে। প্রতিবাসী কেহ অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট, কেহ রোগশয্যায় শায়িত, তাহাদের কষ্ট-নিবারণে—সন্তাপ-দূরীকরণে, কমলা নিয়ত যত্নশীলা। ঐ যে পশ্চিমপাড়ার কুঁড়ে ঘরখানির মধ্যে দুটি অপগোণ্ড শিশু-সন্তান-সহ রামহরি চক্রবর্ত্তীর বিধবা পত্নী কুমুদিনী দেবীক দেখিতেছেন;—বলিতে পারেন কি, তাঁহার চলে কি করিয়া? রামহরির অবস্থা তো কাহারও অবিদিত নাই!

মৃত্যুকালে তাঁহার সৎকারের টাকা কয়টির জন্য কি কষ্টই না পাইতে হইয়াছিল! তার পর, তাঁহার লোকান্তরে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইয়াছে, কেহ সন্ধান লন কি? সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা,—প্রকাশ্যে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনেই বা কি প্রকারে সমর্থ হইবেন? বিশেষতঃ, যে বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছেন, সে বয়সে ঘরের বাহির হইলে দশে-ধর্ম্মেই বা কি কহিবে? তবে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের উপায়? এ কি! সমাজ!—নিরুত্তর কেন? অপরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শ্রবণে, তুমি উৎকর্ণ হইয়া আছ; কিন্তু এই সময়ই যত বধিরতা! অথবা, অপরের দোষ-কীর্ত্তনকালেই তোমার যত কিছু বাক্‌পটুতা। নচেৎ, অন্য সময় তোমার জিহ্বায় জড়তা আশ্রয় করে। কিন্তু যাউক সে কথা। কমলা যদি কুমুদিনীর তত্ত্ব না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি দশা ঘটিত—মনে কর দেখি! কুমুদিনীর ছেলে-মেয়ে দু'টিকে প্রায়ই বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া, কমলা আপনার পেটের ছেলে-মেয়ের মত তাদের আদর-যত্ন করেন; কুমুদিনীর জন্যও প্রত্যহ তিনি সিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কেবল একা কুমুদিনী বলিয়া নহে; গ্রামের আরও দুই একটী অবিরা বিধবা কমলার নিকট যে অল্পবিস্তর সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিন বৎসর পূর্ব্বে নন্দনপুরে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। উত্তর-

পাড়ার অনেকগুলা লোক, সেবার কলেরায় মারা পড়িয়াছিল। কলেরা রোগীর নাম শুনিলে, সেদিকে কেহই যাইতে চাহিত না। যত্নপতির জ্ঞাতি খুড়া তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেবার কলেরায় মারা পড়েন। তারাকান্তের স্ত্রী এবং শিশু-পুত্রদুটীও সেই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু কমলা দিন-রাত্রি শুশ্রূষা করিয়া যেরূপে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন, সে কথা গ্রামের লোক বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিবে না। কমলাকে সেবার কেহ কেহ বারণ করিয়াছিল,—"ওলাউঠা সংক্রামক রোগ। ওলাউঠা রোগীর সংস্পর্শে যাইলে, ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" কিন্তু কমলা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"যদি পেটের ছেলে-মেয়ের কখনও কলেরা হয়, পিতামাতা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান কি? অথচ, পুত্র-কন্যার শুশ্রূষায়, পিতামাতা যে পুত্রকন্যার রোগে আক্রান্ত হন, কদাচ তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ, কলেরা রোগীর দেহ বা মলমূত্র স্পর্শ করিলেই যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার নিশ্চয়তা থাকিত, তাহা হইলে মেথর বা মুদ্দা-ফরাসের বংশ বোধ হয় পৃথিবী হইতে কোন্ কালে লোপ পাইত। যাহা হউক, কলেরার বৎসর কমলা কাহারও বারণ শুনেন নাই। ঔষধ, পথ্য এবং পরিচর্য্যার ব্যবস্থায় তিনি গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন।

হঠাৎ কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—যদুপতির বাড়ীতে পোষ্যবর্গের মধ্যে হলধর বর্দ্ধনের ছেলে-মেয়ে দুটীকে দেখিতে পাই কেন? উহারা সদ্‌গোপ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পরিবারের পোষ্যমধ্যে পরিগণিত হইল কি প্রকারে? ইহাও কমলার কৃপা বলিতে হয়। হলধর বর্দ্ধনের কু-চরিত্রের কথা অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ আছে। সে যে কখন্ কোথায় কোন্ কু-মতলবে পরিভ্রমণ করে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। বিশেষতঃ, কলেরার বৎসরে স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোনই সন্ধান নাই। কেহ বলেন,—স্ত্রীকে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ গ্রাম হইতে পলাইবার সময় পথে ওলাউঠাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেহ বলেন—একটা বদ্‌মায়েসীর মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়া বিগত বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে সে জেলে পচিতেছে। যাহাই হউক, হলধর মরুক আর বাঁচুক তাহাতে কাহারও তাদৃশ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তবে, তাহার পুত্রকন্যা-দুটির আশ্রয়-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে যাহা জনশ্রুতি আছে, তাহাই বলিতেছি। হলধরের স্ত্রীর যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার পুত্রকন্যা দুইটীও তখন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই অবস্থায়, হলধর, স্ত্রী-পুত্র তিনটিকে ফেলিয়া, পলায়ন করে। এ কি! নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন যে? কথাটা, অবিশ্বাস হইল না কি? বলিবেন কি,—'অস্বাভাবিক!' জিজ্ঞাসা

করিবেন কি,—'পতি হইয়া সহধর্ম্মিণীকে, পিতা হইয়া পুত্র-কন্যাকে, এরূপভাবে কখনও কেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে কি? কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন—"Truth is stranger than fiction." অর্থাৎ, উপন্যাস বা কল্পনা অপেক্ষাও সত্য অধিকতর আশ্চর্য্য। এ সংসারে মানুষ পারে না কি?—এ সংসারে মানুষ করে না কি? দেবত্ব ও রাক্ষসত্ব—উভয়ত্বেরই পূর্ণবিকাশ মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ, আপনার মুখের গ্রাস অনায়াসে পরকে প্রদান করিয়া আপনি অনশনে জীবন-যাপন করিতে পারে। মানুষ-দধিচি আপন অস্থি প্রদান করিয়া দেবলোকের ইষ্টসাধন করিয়া থাকে; আবার এই মানুষই সহ ধর্ম্মিণীর শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় স্বামীর গলায় ছুরি দিতে পারে; এই মানুষই, স্নেহময়ী জননীর অটুট মমতা লাভ করিয়াও ক্ষণিক সুখের আশায় মমতার আধার সন্তানকে হত্যা করিয়া মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। এ সংসারে এতাদৃশ বিসদৃশ ঘটনার অসদ্ভাব আছে কি? সেদিনও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শেষোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এক ব্রাহ্মণ-স্কুল-মাষ্টারের পত্নী, উপ-পতির মনস্তুষ্টি-সম্পাদনে পরন্তু আপনার সুখের অন্তরায় মনে করিয়া, আপনার একমাত্র কিশোর পুত্রকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক দিন পরে, গোয়েন্দা-পুলিশের গূঢ় অনু-

সন্ধানে, শয়ন-ঘরের মেজে খুঁড়িয়া, বালকের গলিত স্খলিত মৃত-দেহ বাহির করা হয়। মাদ্রাজের উচ্চ বিচারালয়, বিচারে ব্রাহ্মণ-পত্নীর যে দণ্ডবিধান করেন, সংবাদপত্র-পাঠক অনেকেই সে সংবাদ অবগত আছেন; তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবেই বুঝুন, এ সংসারে সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই। হলধর বর্দ্ধন যে আপন পীড়িত স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, কমলা যখন শুনিতে পাইলেন,—হলধর বর্দ্ধন আপন স্ত্রী-পুত্রদিগকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, তিনি তখন তাহাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে যত্নবতী হইলেন। সেই সময়ই, তাঁহারই চোখের উপর, হলধরের স্ত্রী প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু, মৃত্যুর পূর্ব্বে ছলছল নেত্রে কমলার প্রতি চাহিয়া, অভাগিনী বলিয়া গেল,—"আমার আর কেউ নেই মা! ঐ ছেলে-মেয়ে দু'টি রইলো; যদি বাঁচাতে পারেন, বাঁচান। ও দুটীর ভার আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম আজ!" এই কথা-কয়েকটি কহিয়া যেদিন হলধর-গৃহিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিল, সেই দিন হইতেই তাহার পুত্র-কন্যা-দুটির লালন-পালনের ভার কমলার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কমলা প্রথমতঃ সুচিকিৎসার সুব্যবস্থায় তাহাদিগের জীবন-রক্ষা করিয়াছেন; তার পর তাহাদিগকে আপন আলয়ে আনয়ন করিয়া সন্তানের ন্যায় লালন-পালন

করিতেছেন। শিশু-দুইটীর মা মরিয়াছে বটে; কিন্তু কমলার আশ্রয়ে আসিয়া, কমলার স্নেহ-যত্নে, মা-মরার শোক তাহারা বড় একটা অনুভব করিতে পারে নাই। ফলতঃ, পরিচয় না পাইলে, লোকে হঠাৎ বুঝিতে পারে না,—ঐ দুটী সদ্‌গোপের সন্তান, পরের সংসারে কি ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে!

যাঁহার এত দয়া—যাঁহার এত দিকে দৃষ্টি; সঞ্চয় করিয়া তিনি গহনা গড়াইবেন কি প্রকারে? কাজে কাজেই কমলা, দিন দিন আয়-বৃদ্ধি সত্ত্বেও গহনাগুলি গড়াইয়া লইতে পারেন নাই! তাঁহার গহনাগুলি না গড়ানয়, দোষ কাহারও নাই; দোষ—যদুপতিরও নাই! দোষ—কমলারও নাই! "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!" দোষ কার? ভগবান যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে তো সেই কার্য্যই করিবে? যে গহনা গড়াইবার জন্য নিযুক্ত, সে গহনা গড়াইয়াই জীবনযাপন করুক! যে অন্য কার্য্যে—প্রাণিহিতব্রতে নিযুক্ত, তন্ময় হইয়া—আত্ম ভুলিয়া, সে তো তাহাই করিবে!

যত দিকে যত ব্যয়-বৃদ্ধিই হউক, যদুপতি কিন্তু এবার স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন,—কমলার গহনাগুলি গড়াইয়া দিবেন। বৈশাখ মাসে, 'গুড ফ্রাইডের' ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে বড়ই অনুযোগ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—"তুমি এত দিন এত

রোজগার করিলে; কিন্তু বৌয়ের গহনা কয়খানা গড়াইয়া দিতে পারিলে না? কি অবস্থায় কমলার গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া লইয়াছিলে, একবার মনে করিয়া দেখ দেখি!" বিন্ধ্যবাসিনীর এই কথাগুলি, যদুপতির হৃদয়ে যেন শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনাবধি যদুপতি প্রায়ই ভাবিতেছিলেন,— "কি করিয়া কমলার গহনাগুলি গড়াইয়া দিতে পারি!"

তীব্র উদ্বেগ! দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা! এমন লোকের এমন উদ্বেগ কি দূর হইবে না? এমন লোকের এমন আকাঙ্ক্ষা ভগবান কি অপূর্ণ রাখিবেন? এই সময়, যদুপতির একখানি পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে, খরচ-খরচা-বাদে, ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, যদুপতির হাতে দুই হাজার টাকা নগদ জমিয়া গেল। পূজার যে সব খরচ-পত্র আছে, তাহার ব্যবস্থাবন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। এখন, এই অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা হাতে পাইয়া, যদুপতির আর আনন্দের অবধি রহিল না। যদুপতি অবিলম্বে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট পত্র লিখিলেন; আপাততঃ কমলার জন্য কি কি গহনা গড়ান হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন। যথা-সময়ে পত্রের উত্তর আসিল; বালা, অনন্ত প্রভৃতি মোটা মোটা কয়েকখানা গহনার কথা বিন্ধ্যবাসিনী লিখিয়া পাঠাইলেন। পূজার ছুটির পূর্ব্বে যদুপতির হাতে বিদ্যালয়ের অনেকগুলি

কাজের ভার পড়িয়াছিল; সুতরাং বিন্ধ্যবাসিনীর উত্তর পাইয়াই তিনি গহনাগুলি গড়াইতে দিবার অবসর পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—"বিরাট কলিকাতার সহরে বিরাট্ কারখানা-সমূহ আছে। এই কয়খানা গহনা বৈ তো নয়! কলিকাতার স্বর্ণকারেরা তিন দিনেই এ সকল গহনা গড়াইয়া দিতে পারিবে।" এই বিষয়ে, তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরামর্শ হইল। তিনিও সেই রায়েই সায় দিলেন। বলা বাহুল্য, বন্ধু সমব্যবসায়ী—বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক। বন্ধু কহিলেন,—"অবসর-মত একদিন 'করেন্সিতে' গিয়া গিনি কিনিয়া আনিব। তার পর, রবিবার দিন, দাস কোম্পানীর প্রোপ্রাইটারকে ডাকিয়া গহনা-গুলি গড়াইবার 'অর্ডার' দেওয়া যাইবে।"

এইভাবেই ভাদ্র মাসটা কাটিয়া গেল। আশ্বিনের প্রথমে যদুপতি কমলার এক পত্র পাইলেন। পত্র পাইয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,—"কমলা বোধ হয় দিদির মুখে শুনিয়া গহনার কোনও অদল-বদল করিতে চায়; তাই এই পত্র লিখিয়াছে।" কিন্তু পরক্ষণেই, পত্রখানি পাঠ করিয়া, তাঁহার সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পত্রে কমলা গহনার কথা কিছুই লেখেন নাই। কমলা লিখিয়াছেন,—"এ বৎসর দেশের বড় দুরবস্থা! আশুধান্য আদৌ জন্মে নাই। এখনই নানাস্থানে চুরি-ডাকাতী লুঠতরাজ আ স্ত হইয়াছে। অনেক লোকে এবার

অন্নাভাবে মারা যাইবে। নিকটস্থ দশখানা গ্রামের ভিতর কেহ যে সংবৎসরের খাবার ধানটাও পাইবে, তাহা মনে হয় না। জগদম্বা এবার কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পত্রে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার এইরূপ আরও নানা কথা লিখিত ছিল। যদুপতি তৎপ্রতি তাদৃশ আস্থা-স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"কমলার কোমল প্রাণ। কমলা অল্পেই বিভীষিকা দেখে।" তিনি আপনা-আপনিই মনকে আশ্বস্ত করিলেন,—"এতটা কখনই নয়।" পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল,—"গহনা গড়াইবার কথা হইলেই কমলা আর পাঁচটা অভাবের কথা পাড়িয়া বসে। এ যেন কমলার কি এক বিপরীত স্বভাব।" সুতরাং যদুপতি মনকে প্রবোধ দিলেন,—"যতই যাহা হউক, এবার পূজায় কমলাকে নূতন অলঙ্কারে সাজাইবই সাজাইব।"

সেই দিনই যদুপতি, দাস কোম্পানীর অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই দিনই গহনা-সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা-পরামর্শ হইল। সুবিধা হইলে দুই এক দিন মধ্যে গিনি কিনিয়া দেওয়া হইবে, এবং গিনি কিনিয়া দেওয়ার পর সপ্তাহ-মধ্যে সমস্ত গহনা পাওয়া যাইবে;—কথাবার্ত্তায় এতদূর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া রহিল!

সে দিন, সে রাত্রি যদুপতির মনে অন্য ভাবনা আর

স্থান পাইল না। কমলার গহনার বিষয়ই—তাঁহার এখন একমাত্র ভাবনা। যদুপতি একবার ভাবিতে লাগিলেন,—"কমলা এমন পত্র কেন লিখিল!" আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"অজন্মা-রূপী শয়তান আবার বুঝি আমার শুভ-আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিতে আসিয়াছে!" রাত্রিতে যদুপতির নিদ্রা হইল না। এক একবার তন্দ্রা আসে, এক একবার যদুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসেন। স্বপ্নঘোরে এক একবার তিনি যেন দেখিতে পাইলেন,—"তাঁহার বাসগ্রাম নন্দনপুর প্রেত-পিশাচে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে—কঙ্কালসর্ব্বস্বদেহ, প্রকটগণ্ডাস্থি, অধিলুলিত-চিবুক, অসংখ্য নরনারী 'অন্ন দে! অন্ন দে!' বলিয়া ফুকরাইয়া মরিতেছে। আবার এক একবার তিনি দেখিতে পাই-লেন,—তাঁহার প্রাণাধিকা কমলা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কমলার ন্যায় —অন্নপূর্ণার ন্যায়—অন্নস্থালী হস্তে করিয়া অন্নবিতরণ করিতে-ছেন,—আর যদুপতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এক একবার কহিতেছেন,—'দেখ—দেখ, কেমন অলঙ্কারে আমায় কেমন সুন্দর মানাইয়াছে!" স্বপ্ন দেখিয়া, যদুপতি এক একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, এক একবার আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"কি ভীষণ!" এক একবার মনে হইতে লাগিল,—"মরি মরি!—কি সুন্দর!" তখন নূতন অলঙ্কারে কমলাকে কি সুন্দর মানায়,—সেই ভাবেই

যদুপতি বিভোর হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে বন্ধুবান্ধব সকলে প্রত্যক্ষ করিল,—যদুপতি আর সে যদুপতি নাই; যদুপতির প্রকৃতি প্রভাত হইতে সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইল; উষার আলোক-রাগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার হৃদয়ে কি-যেন কি-এক নবীন আলোক-রাগ উদ্ভাসিত হইল।

সাধ্যের অতীত কোনও কার্য্য করিতে হইলে, মানুষ ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। আপন শক্তিতে কুলান না হইলে, মানুষ ভগবানের নিকট শক্তি-সামর্থ্য ভিক্ষা করিয়া থাকে। দেশে অন্নকষ্টের—দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দর্শন করিয়া, ব্যাকুল হইয়া কমলা যদুপতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে আর কুলাইল না; তিনি তখন তাঁহার পতি-দেবতার নিকট সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কমলা কিশোর-বয়সে পিতামাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন,—"পতিই স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা, পতিই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পতি ভিন্ন নারীজাতির অন্য গতি দ্বিতীয় নাই!" কমলার পিতামাতা তাঁহাকে আরও শিখাইয়াছিলেন,—"প্রত্যক্ষ দেবতা পতি বিদ্যমানে, সাধ্বী-সতীর ভাবনা কি? নারীর মনোবেদনা, অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিবার কোনও আবশ্যক নাই; সে কেবল তাহার প্রত্যক্ষ পতি-দেবতার নিকট আপন অভাব-অভিযোগ জানাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে।" আবাল্য কমলার প্রাণে

সেই শিক্ষাই বদ্ধমূল আছে। কমলার পিতামহ দেশপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি কমলাকে পার্শ্বে বসাইয়া নারীধর্ম্ম-বিষয়ক শাস্ত্রোক্ত বচনসমূহ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া গিয়াছেন। কমলা এখনও সে সকল শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিতে পারে। কমলা এখনও কথায় কথায় স্মরণ করিয়া থাকে,—

"পতির্বন্ধু পতির্গুরু পতির্হি দেবতা নারীনাং।"

"পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, পতিই নারীদিগের দেবতা। পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই।" আর, সেই বিশ্বাসের বলেই, কখনও কোনও গুরুতর ভাবনায় পড়িলে, কমলা তাহা পতিকে জানাইয়াই নিশ্চিন্ত হয়। দেশে ভাবী-বিপৎপাতের লক্ষণ অনুভব করিয়া, কমলা তাই যজ্ঞপতিকে জানাইয়াই নিশ্চিন্ত আছে। কমলা জানে,—"কমলা-পতিই সাক্ষাৎ কমলাপতি! আর্ত্তের পরিত্রাণে, নিরন্নের অন্নদানে, তিনি কি কখনও উদাসীন থাকিতে পারেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কি আনন্দ! স্বদেশ-প্রত্যাগমনে কি আনন্দ। যার স্বদেশ আছে, তার কি আনন্দ!

পূজার সময় বাড়ী যাওয়ায় বাঙ্গালীর যে আনন্দ, বুঝি তেমন আনন্দ কোনও জাতির কখনও হয় না! সংবৎসরের পর, পিতামাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব,—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের চরণধূলি মস্তকে লইব; স্নেহের আধার পুত্র-কন্যার মুখ দেখিব,—তাহাদের অস্ফুট আধ-আধ সুধামাখা-স্বরে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব;—প্রাণে কত আশা—কত পিপাসা! প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় পথপানে চাহিয়া আছে,—দিন দিন দিন গণনা করিয়া কত কষ্টেই দিনযাপন করিতেছে! কতদিন পরে আবার তাহাকে দেখিব, কতদিন পরে আবার তাহার সুখসঙ্গ লাভ করিব,—এ আনন্দের অবধি আছে কি?

পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার জন্য যদুপতি দেশে রওয়ানা হইয়াছেন। বাসার বালকেরা, ছুটী পাইয়া, সকলেই বাড়ী

চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাসায় চাবি বন্ধ করিয়া, একজন দ্বারবানের উপর বাসার ভার দিয়া, যদুপতি দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্মুখে শরতের স্বচ্ছ আকাশে তৃতীয়ার চন্দ্রে কেমন হাসি-রেখাটুকু বিকাশ পাইয়াছে! গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর দাঁড়াইয়া যদুপতি তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; আর মনে মনে ভাবিতেছেন,—"কাল প্রভাতে নূতন অলঙ্কারে কমলার মুখেও ঐ হাসির বিকাশ দেখিব!"

চাঁদের আলো উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতে, রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই, যদুপতির নৌকা পলাশপুলির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে নন্দনপুর ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পাল্কী বা গোযান ব্যতীত সে গ্রামে পৌছিবার উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া ছিল। যদুপতির বাড়ী হইতে তাঁহার গোমস্তা ও চাকর-বাকর আসিয়া, পাল্কী লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এবার তিনি গোমস্তাকে ঘাটে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। সুতরাং নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনাকে আসিতে বলার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পশ্চাতে আরও দুই খানা নৌকা আসিতেছে। সেই নৌকায় অনেক জিনিসপত্র আছে। সেই সব নামাইয়া, গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়া, বাড়ী লইয়া

যাইতে হইবে। আজ রাত্রে সকলেই এখানে অবস্থান করা যাউক। কাল প্রাতে জিনিষ-পত্র রওনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি অগ্রসর হইব। আপনি পশ্চাতে সকলকে গুছাইয়া লইয়া যাইবেন।”

পলাশপুলি প্রসিদ্ধ বন্দর। গরুর গাড়ী সর্ব্বদাই সে বন্দরে পাওয়া যায়। সুতরাং পরামর্শ অনুসারে সেই রাত্রেই কুড়ি পঁচিশ খানি গরুর গাড়ীর বায়না হইয়া রহিল।

যদুপতি গমস্তাকে আরও বলিয়া দিলেন—“বন্দর হইতে প্রাতে কতকগুলা হাঁড়ি, সরা, মালসা ও হাতা বেড়ী কিনিয়া লইবেন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

— * —

মধ্যাহ্নে যদুপতি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ীতে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তিনি পাল্কী হইতে নামিতেই, তাঁহার শিশু পুত্রটি "বাবা" বলিয়া কোলে উঠিয়া বসিল; জ্যেষ্ঠ পুত্র মণিমোহন, পঞ্চম বর্ষীয় বালক, তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীগণও চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। পথে—গ্রামের কত লোক, তাঁহাকে দেখিবার জন্যই দণ্ডায়মান ছিল। ব্রাহ্মণ-শূদ্র বা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে, তাহারা কেহ বা যদুপতিকে প্রণাম করিল, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

যদুপতি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দিদির চরণে প্রণত হইলেন। কমলা ও কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

যদুপতির আহারের সময়, কথায় কথায় বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, বৌয়ের কি গহনা এনেছিস্—দেখালি-নে তো! কমলার জন্যে আমি যে যে গহনার কথা লিখে দিয়েছিলাম, তার সবগুলা বুঝি আন্‌তে পারিস্-নি।"

যদুপতি মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"না দিদি! কমলা পত্র লিখে সব উল্‌টে দিয়েছে। গহনার অদল-বদল হয়ে গিয়েছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী ভাবিলেন,—"বোধ হয় কমলা নূতন কিছু গহনার ফর্‌মাস্ করেছিল। তাই আমার পছন্দ-মত সব গহনাগুলি গড়ান হয় নাই।" তা না হউক, তাহাতে বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু অণুমাত্রও ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না। কমলার প্রতি তাঁহার ঈর্ষা-দ্বেষ তো একটুও নাই! কমলা যাহাতে সুখী হয়, কমলার যাহা পছন্দ-সই হয়,—তাঁহারও তো তাহাই ইচ্ছা! বিন্ধ্যবাসিনী তাই উত্তর দিলেন,—"গহনার অদল-বদল যাই হ'ক, কমলার পছন্দ হ'লেই হ'লো!"

যদুপতি আনন্দের স্বরে কহিলেন,—"তবে দিদি! নিশ্চিন্ত হও। কমলা যা ভালবাসে, এবার সেই গহনাই এনেছি। খানিক পরেই দেখ্‌তে পাবে,—সে গহনায় ঘর-সংসার কত উজ্জ্বল হয়।"

কমলা পার্শ্বে বসিয়া ছিল। সে মনে মনে যদুপতিকে শত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

যদুপতি তখন একে একে ভগিনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন,—কি প্রকারে তাঁহার দুই হাজার টাকা জমিয়াছিল। বলিলেন,—সেই টাকার গহনা গড়াইবার জন্য

তিনি কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বলিলেন,—কমলার পত্র পাইয়াই কিরূপভাবে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হয়। বলিলেন,—সেই টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কত মণ চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। বলিলেন,—ঐ চাউলগুলি উপলক্ষ করিয়া অন্নকষ্টের সময় বাড়ীতে কিরূপ একটী অন্নসত্র খুলিবেন। বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, বল দেখি দিদি! সেই অন্নসত্রে কমলা যখন হাতা-বেড়ী হাতে করে অন্ন-বিতরণ করবে, তখন সে অলঙ্কারে তার কত শোভা হবে? স্ত্রীলোকের স্বর্ণ-অলঙ্কার শ্রেষ্ঠ-ভূষণ, কি হাতা-বেড়ী ধরে অন্ন-বিতরণ শ্রেষ্ঠ-ভূষণ, দিদি, এ বয়সে আজিও আমি তা নির্ণয় করতে পারলাম না। তাই সোণার অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে, কমলার জন্য আমি এই অভিনব অলঙ্কার এনেছি।"

উপসংহার।

— * —

মহাসপ্তমীর মহোৎসবের দিন, কমলা সেই নূতন অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে। মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, নন্দনপুরে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে।

কমলার আজ কি আনন্দ! তাহার মনে হইতেছে,—বুঝি শত স্বর্ণ অলঙ্কারেও তাহার তেমন শোভা খুলিত না!

যেখানে যদুপতি আছেন, যেখানে কমলা বিরাজমানা,—সেখানে শোভার অভাব কি আছে? শত অজন্মা হইলেও সেখানে অন্নকষ্ট দুর্ভিক্ষ কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে শোভার অভাব কি প্রকারে হইবে? যাঁহাদের যদুপতি আছেন, যাঁহাদের কমলা আছেন, তাঁহারা সেই শোভা সর্ব্বদা দেখুন! দেখুন—যদুপতি কেমনভাবে অন্ন-সরবরাহ করিতেছেন! দেখুন,—কমলা কেমনভাবে অন্নবিতরণে ব্রতী আছেন! দেখুন,—যদুপতির সার্থক উপার্জ্জন। দেখুন,—কমলার সার্থক অলঙ্কার-ধারণ!

শিক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমল ও বিমল—একই বৎসরে একই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। একই গ্রামে বাস, একই বিদ্যালয়ে পাঠ, একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন—পরস্পরকে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। অমল ব্রাহ্মণ, বিমল শূদ্র; কিন্তু উভয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধনে সে বিভেদ বাহিরে বড় বুঝা যাইত না।

অমলের পিতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যজন-যাজন দ্বারা কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। বিমলের পিতা দেবেন্দ্র-নাথ রায় ওকালতীতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাদের মধ্যেও প্রগাঢ় প্রণয় ছিল।

বিশ্বনাথের পিতা পুত্রকে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন; দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ইংরাজী পড়িতে যান।

ফলে, দুই জনে দুই পথে দুই অবস্থায় উপনীত হন। এক জন যজন-যাজনকারী; অপর জন ব্যবহারাজীবী।

দেবেন্দ্রনাথ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। বিশ্বনাথ, অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও, প্রধান স্মার্ত্ত হইয়াও, আবশ্যকানুরূপ অভাব-পূরণে সমর্থ নহেন। বিশ্বনাথ বড় ক্ষোভে তাই পুত্রকে ইংরাজী শিখাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বুঝিয়াছেন,—'শাস্ত্র-আলোচনা বৃথা,—সংস্কৃত শিক্ষায় আর কোনও ফল নাই।' বিশ্বনাথ বুঝিয়াছেন,—'ইংরাজী না শিখিলে দৈন্য-দারিদ্র্য, ঘুচিবে না,—দুঃখ-ক্লেশ দূর হইবে না।'

বিশ্বনাথ প্রথমে গ্রাম্য-পাঠশালায় অমলকে পড়িতে দেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন আপন পুত্রকে মহকুমায় লইয়া গিয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, বিশ্বনাথও তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথের এক দূর আত্মীয় সেই মহকুমায় মোক্তারী করিতেন। তাঁহাকে ধরিয়া, অমলের জন্য এক মুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া লইলেন। স্কুলের বেতন, পড়িবার বই এবং জলপানি প্রভৃতি নিজেই কায়ক্লেশে যোগাইতে লাগিলেন। বিমল আপনার পিতার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। একই পাঠশালার একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া মহকুমায় আসিয়া অমল ও বিমল উভয়েই একই শ্রেণীতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ে অমল ও বিমল দুই জনই প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। পরীক্ষায় দুই জনই তুল্যমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কখনও বা অমল প্রথম স্থান অধিকার করিত, বিমল দ্বিতীয় হইত; আবার কখনও বা অমল দ্বিতীয় হইত, বিমল প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এতই প্রীতির ভাব ছিল যে, পরীক্ষায় অমল প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বিমল প্রীত হইত, আবার বিমল প্রথম স্থান অধিকার করিলেও অমল প্রীত হইত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় অমল ও বিমল উভয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, উহাদের উভয়েরই বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে তাহাদের ভাগ্যে বৃত্তিলাভ ঘটিল না। বিমলের পিতা বিমলকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। দেখা দেখি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও অমলকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। বিমলের পিতা দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একই বাসায় বিমলের সহিত অমলকে রাখার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অমল ও বিমল উভয়েই একই বিদ্যালয়ে একই প্রকার পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— * —

"ভাই! তুই বমি কর্‌লি কেন? তোর শরীরটা অমন হ'ল কেন?"

বিমল, অমলের মাথার শিয়রে বসিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, জিজ্ঞাসা করিল,—"একি!—আবার বমি আস্‌ছে নাকি?"

অমল।—"না, আর বমি হ'বে না!"

বিমল।—"আচ্ছা, কেন বমি হ'ল ব'ল্‌ দেখি!"

অমল ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল,—"পাতের কাছে বস্‌তেই আমার গা-টা যেন কেমন ক'রে উঠ্‌লো? ডাল্‌টে মুখে দিতেই বমি আস্‌তে লাগ্‌লো! কি দুর্গন্ধ!"

বিমল।—"তখনই তুই বল্‌লি-নে কেন?"

অমল।—"ব'ল্‌বো কি, আর পাঁচ জন খেতে বসেছে! পাছে তাদের খাওয়া নষ্ট হয়, তাই আমি অনেক ক্ষণ মুখ টিপে ব'সে থাক্‌লাম। শেষ যখন কিছুতেই সাম্‌লাতে পার্‌লাম না, উঠে বাইরে চলে গেলাম।"

বিমল।—"আচ্ছা, কিসে অমনটা হ'ল?"

অমল।—"পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ 'ভকভক' ক'রে উঠ্‌লো!

বিমল।—"পেঁয়াজের গন্ধ তোর এতটা অসহ্য হ'ল?"

অমল।—"কখনও তো অভ্যাস নাই! বাড়ীতে চিরদিনই আলো-চাল আর নিরামিষ পাক খেতাম। হারু দাদার বাসায় এসে মাছটা অভ্যাস হয়েছিল বটে; কিন্তু তত ইচ্ছের সঙ্গে খেতাম না। এখানে এ কি বিট্‌কেল খাওয়ার পদ্ধতি!"

বিমল।—"পাঁচ জনে যা খায়, তাই তো খেতে হ'বে! এক এক জনের জন্য তো আর এক একরূপ বন্দোবস্ত হ'তে পারে না!"

অমল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"সইতে সইতে সব সয়ে যাবে!" মনে মনে কহিল,—"যখন এ পথে এসেছি, সওয়াতেই হ'বে।"

বিমল কহিল,—"একটা লেমনেড্‌ খা দেখি! এখনই সব সেরে যাবে!"

বিমলের নিজের জন্য একটা লেমনেড আনা ছিল; তাহার খানিকটা ঢালিয়া সে অমলকে প্রদান করিল।

অমল প্রথমে লেমনেড খাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু বিমল বুঝাইল,—"উহাতে মাত্র নেবুর সিরাপ আছে, খেতে কোনও দোষ নেই। লেমনেড খেলে পেটের জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্ত দূর হবে।"

অগত্যা অমল, বিমলের অনুরোধে, খানিকটা লেমনেড্‌

গলাধঃকরণ করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার মুখমণ্ডলে বিকৃতির ভাব প্রকাশ পাইল। লেমনেড্ পান করিয়া অমল কহিল,—"উঃ! কি ঝাঁঝ!—এ আবার তোরা সখ্ ক'রে খাস!"

বিমল।—"ওতে অনেক উপকার আছে। মেসের সব গুরু-পাক জিনিষ খেতে গেলে, লেমনেড সোডা সময় সময় খাওয়া উচিত।"

অমল।—"তা বটে! কিন্তু ও খাওয়া খাই কি করে?"

বিমল।—"ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর্‌তে হবে! অভ্যাস হলে আর কোনও কষ্ট হবে না।"

অমল মনে মনে কহিল,—"ভাল, তাই হ'বে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

— * —

দ্বিতীয় দিন আহারে বসিয়াই অমল উঠিয়া আসিল। বিমল পাছে পাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, আজ আবার কি হ'ল? আজ আবার ব'সেই উঠে এলি যে?"

অমল দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরবে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

বিমল আগ্রহ-প্রকাশে জিজ্ঞাসা করিল,—"চুপ ক'রে রইলি যে? কি ভাব্‌ছিস্‌?"

অমল উদ্বেগভরে উত্তর দিল,—"ভাব্‌বো আর কি ছাই!"

বিমল।—"তবে উঠে এলি কেন?"

অমল।—"উঠে এলাম কেন—শুন্‌বি? এক পংক্তিতে এক সঙ্গে ব'সে বামুন-শূদ্রে ভাত খাবে! ইংরেজী শিখ্‌তেই এসেছি বটে; কিন্তু তাই ব'লে তো আর জাত-কুল খোয়াতে আসি-নি!"

বিমল মনে মনে একটু হাসিল; কহিল,—"মেসের বাসা; এখানে কি আর ও সব দেখ্‌লে চলে? এখানে সকলেই সমান পয়সা দেয়! খাওয়ায়, বসায়, সকলেরই সমান অধিকার। এখানে ওসব কথা বল্‌তে নেই। অনেকে তাতে অসন্তুষ্ট হ'তে পারে!"

অমল।—"তা যাই বল, যাই কর ভাই, ও সব পোষাবে না।"

বিমল।—"তা হ'লে কল্‌কাতার মেসের বাসায় থেকে পড়্‌তে আসা তোমার উচিত হয়-নি! এ অবস্থায় তোমার বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল।"

অমল।—"তাই তো, কি করি, ভেবে পাচ্ছি-নে!"

বিমল।—"যাই ভাব—যাই কর ভাই, মনে রেখো,—তোমার বাবা বড় আশা করে তোমায় ইংরেজী পড়্‌তে দিয়েছিলেন।"

বিমলের উত্তরে অমলের প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। অমল ভাবিতে লাগিল,—"তাই তো! বাবা যে বড় আশা ক'রে আমায় ইংরেজী শিখ্‌তে পাঠিয়েছেন! তিনি যে বড় কষ্ট ক'রে আমার পড়ার ব্যয় যুগিয়ে আস্‌ছেন! আমি কি করি?"

বিমল।—"চুপ ক'রে রইলি যে? চল্—ভাত খাবি চল্!"

এই বলিয়া হাত ধরিয়া বিমল অমলকে ভাত খাইতে লইয়া গেল। অমল আর দ্বিরুক্তি করিল না। বিমলের অনুরোধে অমল আহার করিতে বসিল।

অমল আহারে বসিল বটে; কিন্তু আহার করিতে পারিল না। দুই এক মুঠা ভাত চট্‌কাইয়া রাখিয়াই অমল উঠিয়া আসিল। বিমল ভাবিল,—'দুই এক দিনের মধ্যেই এ সব অভ্যাস হ'য়ে যাবে; তখন আর কোনও গোল থাক্‌বে না।'

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

শনিবার—কলেজের ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাত্রগণের নিকট একটী বিজ্ঞাপন-পত্র প্রচারিত হইল। অধ্যাপক মিঃ সার্দ্দা সেদিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় কলেজের 'হল'-ঘরে 'শিক্ষা' বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিবেন। বিজ্ঞাপন-পত্র—সেই বক্তৃতা-সংক্রান্ত। প্রত্যেক ছাত্রকে সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেই বিজ্ঞাপন-পত্র ভিন্ন, অধ্যাপক সার্দ্দা প্রত্যেক ছাত্রকে স্বতন্ত্রভাবে বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত বক্তৃতা; কলেজের একজন প্রধান অধ্যাপক ছাত্রগণকে উপদেশ-ছলে সেই বক্তৃতা করিবেন; সুতরাং সকল ছাত্রকেই সেই বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল।

অমল ও বিমল, পাঁচটা বাজিবার অনেক পূর্ব্বে আসিয়া, আপন-আপন আসন গ্রহণ করিল। বক্তৃতা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে হল-ঘর ছাত্রমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কলেজের

অন্যান্য অধ্যাপকগণের অনেকেই বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন। সহরের নামজাদা দুই চারি জন ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়া মিঃ সর্দ্দার বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন।

বক্তৃতায় শিক্ষা বিষয়ক। কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সার্দ্দা অনেক কথার আলোচনা করিলেন। অধ্যাপক বুঝাইলেন,—সামাজিক সঙ্কীর্ণতাই সুশিক্ষা-লাভের প্রধান অন্তরায়। অধ্যাপক বুঝাইলেন,—'যেদিন দেশ হইতে জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া যাইবে, যেদিন ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান—এবম্প্রকার পার্থক্য বিদূরিত হইবে, সেই দিনই ভারতসন্তান সুশিক্ষা-লাভে সমর্থ হইবে।' 'অধ্যাপক আরও বুঝাইলেন,—ভেদাভেদের অন্তরায়ই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়; আহারে, বিহারে, আচারে, বিচারে—ব্রাহ্মণ-শূদ্র উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান পরিহার করিতে না পারিলে, শিক্ষার পথ কখনই প্রশস্ত হইতে পারিবে না।' প্রসঙ্গতঃ তিনি কত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন; প্রসঙ্গতঃ কত উপমার অবতারণা করিয়া আপন বক্তব্য বিষয় তিনি বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। বক্তৃতার তখনও শেষ হইল না। অমল চুপিচুপি বিমলের গা টিপিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল,—তার সন্ধ্যার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং সে বাসায় যাইতে চায়। বিমল বাধা দিল। কাণে কাণে কহিল,—"এ অবস্থায়

উঠিয়া যাইলে, তোমার প্রতি অধ্যাপকের দৃষ্টি পড়িবে; তাহাতে তিনি রুষ্ট হইতে পারেন।"

অমল ভাবিল,—"সম্মুখের আসনে আসিয়া উপবেশন করিয়া সে ভাল কাজ করে নাই।" এদিকে সন্ধ্যার সময় অতীত হয় মনে করিয়াও তাহার মনে বড় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। বক্তৃতায় এত বিলম্ব হইবে জানিলে, তাহার সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আসাই উচিত ছিল অথবা না আসাই ভাল ছিল! ভাবিতে ভাবিতে অমল বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। রাত্রি আটটার সময় যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখন তাহার চিত্ত বিবিধ চিন্তায় এতই অভিভূত হইয়াছিল যে, বিমল না ডাকিলে সে হয় তো সেইখানেই বসিয়া থাকিত।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় অমল ক্ষুব্ধস্বরে বিমলকে কহিল,—"উপনয়নের পর সন্ধ্যার সময় আমার সন্ধ্যাহ্নিক আর কখনও বাদ পড়ে নাই। আজ কি কুক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল!—কি কুক্ষণেই আজ বিকালে বাসার বাহির হইয়াছিলাম!"

অমলের কথায় বিমল উত্তর দিল,—"অধ্যাপক সার্দ্দার অমন বক্তৃতা শুনেও তোমার হৃদয় একটু প্রশস্ত হ'ল না। কি ঘোর সঙ্কীর্ণতায় তোমায় ঘেরে রেখেছে! লেখা-পড়া শিখ্‌তে হ'লে, শুন্‌লেই তো, ও সব অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। অধ্যাপক সার্দ্দা কি একটা যে-সে লোক! যে সব

মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করলেন, মনে ক'রেই দেখ দেখি—তাঁরা এ সব সঙ্কীর্ণতা—এ সব অন্ধবিশ্বাস কেমন পদদলিত ক'রেছিলেন। উচ্চ আশা করলে—উচ্চ অকাঙ্ক্ষা করলে, কেমন—অধ্যাপক বললেনই তো, উদার হ'তে হবে, অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করতে হ'বে।"

অমল।—"তুমি কি ভাই তবে বলতে চাও, দিনান্তে একবার—মুহূর্ত্ত সময়, ইষ্টদেবতার নামটাও করবো না?"

বিমল।—"তা করতে মানা করছি-নে। তবে তারও সময় আছে! কেন, তুমি হিতোপদেশে তো পড়েছ ভাই,—'অজরা-মরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ'!"

অমল কহিল,—"সবই শুনেছি—সবই বুঝেছি! কিন্তু মন মানে কৈ?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে অমল ও বিমল দুই জনে বাসায় আসিয়া উপনীত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে অমলের আর নিদ্রা হইল না। নানা ভাবনায় নানা চিন্তায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

অমল একবার ভাবিল,—'আমি এ কোথায় আসিলাম—কি করিলাম! আমি কোন্ বংশের সন্তান! আমার এ কি পরিণাম ঘটিতে চলিল!' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল,—'অধ্যাপক সার্দ্দা বলিয়াছেন, এ সব সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে না পারিলে বড় হইতে পারা যায় না! সুতরাং এ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পার হওয়া আবশ্যক।'

"তবে কি আবাল্য যে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছি, পিতৃ-পিতামহগণ যে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন,—সে কি ভ্রান্ত শিক্ষা!"

"তাই তো সপ্রমাণ হয়! অধ্যাপক সার্দ্দা যে সকল মহাজনের নাম করিলেন, সত্যই তো, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পরিহার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন!"

"তাই বলিয়া কি স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব!—তাই বলিয়া কি পিতৃ-পুরুষের নাম লোপ করিব! না—আমার এমন লেখা-পড়া শেখায় দরকার নাই!"

"সে কি বলি! আমার পিতা আমার লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়া মাস মাস ব্যয়সঙ্কুলান করিতেছেন। তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ইংরেজী শিক্ষার জন্য আমায় কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন! তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, ভালই বুঝিয়াছেন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান নই।"

"কিন্তু কলিকাতার মেসে যে এমন বীভৎস ব্যাপার, এখানে থাকিয়া পড়া-শুনা করিতে গেলে জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা' তিনি নিশ্চয়ই জান্‌তেন্ না। তা' বুঝ্‌তে পার্‌লে তিনি কখনই কলিকাতায় আমাকে পড়িবার জন্য পাঠাইতেন না।"

বোঝেন নাই-ই বা কি করিয়া বলি! তিনি প্রবীণ বহুদর্শী। অনেক বিচার-বিতর্কের পর তিনি যখন আমায় ইংরাজী পড়ানই স্থির করেন, তখনই তো এ সব কথা উঠেছিল? কিন্তু দারিদ্র্য-দুঃখে একান্ত ক্ষোভে তিনি এই পথ অবলম্বনই আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। তিনি যখন আমায় এই পথে অগ্রসর করিয়েছেন, তাঁর যখন ইচ্ছা আমি এই পথেই অগ্রসর হই; আমার সে সব ভাব্‌বার কি প্রয়োজন? অধ্যাপক সার্দ্দা ব'ল্‌লেন, সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'য়েও সংস্কার বশে যে মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। আমারও এ তাই দেখছি!"

"সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক হ'লো না!—নাই হ'লো; তাতে আর দোষ

কি? 'ঈশ্বরকে ডাকার আবার কালাকাল কি?"—অধ্যাপক সার্দ্দা কেমন সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন! আমি শূদ্রের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে আহার ক'র্‌তে নারাজ; কিন্তু পরিচ্ছন্নতাই আহারের সারভূত স্বাস্থ্যের মূল!—অধ্যাপক সার্দ্দা কেমন তা বুঝিয়ে দিলেন! মেসের যে বামুন, সত্যই তো, সে বামুন কিনা—তাই বা কে বল্‌লে? মেসের ঝি-চাকর যাহারা, তাহারা জল-আচরণীয় কিনা, কে সে সন্ধান রাখে? তবে আর আমার জাত কোথায় আছে?"

"গিয়েছে—সবই গিয়েছে! খুইয়েছি—সবই খুইয়েছি! মিথ্যা সংস্কারটা নিয়ে আর কেন তবে সঙ্কল্প-সাধনে পরাঙ্মুখ হই! পিতা কলিকাতায় পাঠিয়েছেন, ইংরেজী লেখা-পড়া শিক্ষার জন্য। উত্তাপে বিগলিত হ'য়ে ধাতু ছাঁচের মধ্যে পড়েছে; কারিকর যেমন ভাবে তাকে গড়িয়ে নেবে, সেই ভাবেই তাকে তৈরি হ'তে হবে। সুতরাং ভেবে আর ফল কি? ক'ল্‌-কাতা যে জন্য এসেছি, সে কাজ যাতে সিদ্ধ হয়, তাই ক'রে যাই। খাওয়া, শোওয়া, বসা, পরা—সে সব কিছু দেখার আর দরকার নেই। যে ভাবে থাক্‌লে, যে ভাবে চ'ল্‌লে ইংরেজী লেখা-পড়া শিখ্‌তে পারা যায়, পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই ভাবেই থাক্‌তে হবে—সেই ভাবেই চল্‌তে হবে।"

* * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

— * —

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—“কি রে, কাল তুই স্কুলে এলি-নে কেন ? ঘোষ সাহেব তোকে কত খুঁজ্‌লেন !”

নরেন্দ্র।—“না ভাই, কাল আস্‌তে পারি নাই।”

সুরেন্দ্র।—“কেন, হয়েছিল কি ?”

নরেন্দ্র।—“মার কাল বাৎসরিক গেল ; সেই জন্য আস্‌তে পারি-নি।”

সুরেন্দ্র। - “তোদের বাড়ীত সব বাড়াবাড়ি ! আজ মনসা পূজো, কাল মাকাল পূজো, পরশু ষষ্ঠী ;—তা ছাড়া বার মাসে তের পার্ব্বণ তোদের বাড়ী তো লেগেই আছে ! ঘোষ সাহেব কালকে বল্‌ছিলো,—তোর যে রকম মেধা ছিল, তুই যদি একটু খাট্‌তিস্ খুট্‌তিস্, যাতে-বথাতে সময়টা কাটিয়ে না দিতিস্ ; তুই হয় তো এবার ‘কম্পিট’ ক’র্‌তে পারতিস্ ! তোর কাগজ দেখে খুসি হ’য়ে, তাই ঘোষ সাহেব তোকে খুঁজ্‌ছিল। তুই বড় কামাই করিস ব’লে তিনি যেন একটু বিরক্ত হ’লেন।”

ঘোষ সাহেব কাগজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহার খোঁজ করিয়াছেন শুনিয়া, নরেন্দ্রের মনে একটু আহ্লাদ হইল বটে; কিন্তু এক দিন কলেজ কামাই করায়, তাহার প্রতি যে অনুযোগ হইয়াছে, তাহার উত্তরে নরেন্দ্র কহিল,—"পড়াশুনা যেমন আছে, তেমনি আবার কর্ত্তব্য ধর্ম্মও আছে! যাঁদের পুণ্যে জীবন ধারণ, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কি একটুও সময় হবে না?"

সুরেন্দ্র।—"কিন্তু তুই বড়ই কলেজ কামাই করিস্। কাল ও কথা নিয়ে বেশ একটু আলোচনা চ'লেছিল।"

নরেন্দ্র।—"কি ক'রবো, ভাই!—যা না ক'রলে নয়, তা কেমন ক'রে উপেক্ষা করি? পাল-পার্ব্বণ বা ক্রিয়া-কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।"

সুরেন্দ্র।—"কলেজে আসাটাও কি তেমনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়?"

নরেন্দ্র।—"কর্ত্তব্য বৈ কি! সাধ্যমতে আমি সে কর্ত্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করি না। নিতান্ত যা নহিলে নয়, তাই ক'রতে গিয়ে দুই এক দিন কামাই হয় বটে; কিন্তু হিসেবে ঠিক আছে—আমার।"

সুরেন্দ্র।—"হিসেব তো তোর ভারি ঠিক আছে! এই তো কামাই ক'রে ক'রে, তোর 'পার্সেণ্টেজ' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!"

নরেন্দ্র।—"না—তা হয়-নি। পিতামাতার আশীর্ব্বাদে আমার শরীরটে যদি এ কটা দিন ভাল থাকে, হয় তো আমার 'পার্সেণ্টেজ' সকলের চেয়ে বেশী হ'বে!"

সুরেন্দ্র।—"তা হ'লেই ভাল। কিন্তু মনে কর্ দেখি, যদি তুই কামাই না ক'রে লেকচারগুলি সমস্ত শুন্‌তিস, তা হ'লে তোর পরীক্ষার ফল কত ভাল হ'ত!"

নরেন্দ্র।—"বাপ মার পুণ্যে যা হ'বার তাই হবে। ফলাফলে আমার হাত কি? তবে সাধ্যমতে আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না, তা তুই নিশ্চয়ই জানিস্। বাবা বলেন,—পড়াশুনাও যেমন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার-ব্যবহার রক্ষাও তেমনই প্রয়োজন।"

সুরেন্দ্র।—"কলেজে পড়তে গেলে ও সব আর চ'লে না। সময়ও হয় না, সুবিধেও পাই না। কাজেই মনে মনে থাক্‌লেও অনেক কাজ করা যায় না।"

নরেন্দ্র।—"মনে থাক্‌লে আবার করা যাবে না কি? বাবা বলেন,—যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা না করে, তার ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়।"

সুরেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে কহিল,—"তুই সন্ধ্যে আহ্নিক ক'রার সময় পাস্ কখন্, বল দেখি!"

নরেন্দ্র।—"মন থাক্‌লে কি ভাই আর সময়ের অভাব হয়?"

সুরেন্দ্র।—"উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য সে দিন যে

প্রফেসার বোসের সঙ্গে তুই 'বোটানিকাল গার্ডেনে' গাছপালা দেখ্‌তে গেলি, আস্‌তে রাত্রির হ'য়ে গেল; সন্ধ্যা কর্‌লি কখন্‌, বল দেখি ভাই?"

নরেন্দ্র।—"কেন?—বাড়ী গিয়ে রাত্তিরে!"

সুরেন্দ্র।—"সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল না কি?"

নরেন্দ্র।—"তা একটু হ'য়েছিলো বৈ কি! কিন্তু তা ব'লে আর ক'রবো কি? প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'ল!"

সুরেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল; মনে মনে কহিল,—'এতটা সময় অন্যদিকে দেয়; অথচ, পড়াশুনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে! আশ্চর্য্য প্রতিভা!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

সুরেন্দ্রের পিতার নাম হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যোত্রবান গৃহস্থ। দেশে জোতজমা রাখেন; কলিকাতায়ও তাঁহার বেশ একটু কারবার আছে। সেই সূত্রে এবং পুত্র নরেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে, তিনি কলিকাতায় একটী বাসা রাখিয়াছেন। স্বগ্রামের ও পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রাম-সমূহের যদি কেহ কখনও কলিকাতায় আসেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটী তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সর্ব্বদা দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

অমলের কলিকাতায় আসার প্রায় সাত মাস পরে, অমলের পিতা বিশ্বনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন। নিমন্ত্রণ-রক্ষার পর, বিদায়ান্তে, পুত্র অমলচন্দ্রেকে একবার দেখিবার জন্য এবং কয়েকটা জিনিষ-পত্র ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দুই এক দিন কলিকাতায় থাকার আবশ্যকতা অনুভব করেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে মেসের বাসায় স্থান লওয়া কর্ত্তব্য নয়; বিশেষতঃ, হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় দেশের সকলেই আসিয়া সমাদর লাভ করেন জানিয়া, তিনি সেই

বাসায়ই আসিয়া উপস্থিত হন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস-গ্রাম হইতে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাস-গ্রাম ছয় সাত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু, তাহা হইলেও, পরস্পরের বেশ একটু জানাশুনা হইয়াছিল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন কলিকাতায় আসেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কলিকাতার বাসাতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে পাইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক দিন পরে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েরই আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিল। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—কত বিষয়ের কত কথারই আলাপ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় ছেলেদের শিক্ষার কথা উঠিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"আপনার অমলকে ক'ল্‌কাতায় রেখে পড়াচ্ছেন শুনেছি। কৈ, আমায় তো কখনও সে সব কথা কিছু বলেন-নি!"

বিশ্বনাথ।—"দেবেন আমার বাল্যবন্ধু। তার বিমল আর আমার অমল গোড়াগুড়ি থেকেই এক সঙ্গে পড়তো। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট। তাই তাদের দুই জনকে এক বাসাতে রাখারই ব্যবস্থা করেছি।"

হরমোহন।—"তা ভালই ক'রেছেন। আমি সে কথা বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি কি, আপনাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের

ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখ্‌তে যাবে, তা হ'লে উপায় কি হবে? একেই সমাজ যেতে বসেছে। আপনারও যদি সমাজের প্রতি একটু না চাইবেন, উপায় কি হবে?"

বিশ্বনাথ মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"এ কথা আজকাল অনেকে ব'লে থাকেন বটে; কিন্তু তলিয়ে কেউ বড় একটা বুঝে দেখেন না। দেখ্‌ছেনই তো, এখন যেরূপ দিনকাল পড়েছে, তাতে ইংরেজী না শিখ্‌লে আর চলে কি ক'রে!"

হরমোহন।—"আপনিও সেই কথা ব'ল্‌ছেন!"

বিশ্বনাথ।—"না ব'লে আর করি কি?" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায়ে আর কি সুখ আছে? সবই তো সংসারের সুখ-শান্তির জন্য! তাই যদি না হ'ল, তবে আর কিসের জন্য কি?"

হরমোহন।—"আপনার মুখে এ উত্তরের আশা করি নাই।"

বিশ্বনাথ।—"এ উত্তর কি আমি দেই! দিন-কাল-পাত্র-অবস্থায় এ উত্তর দেয়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এখন কি আর সেদিন আছে? আগে কত পাওনা-গণ্ডা ছিল! এখন সব উঠে গিয়েছে! বাবুরা যতই বড় হচ্ছেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দিকে ততই তাঁদের দৃষ্টি কমে আস্‌ছে! পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ পূজা-পার্ব্বণ তো প্রায় উঠেই গেল! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়—সে এখন বাজে খরচের মধ্যে গণ্য। তাও আবার সুপারিশের জোর না থাক্‌লে, নিমন্ত্রণ পাওয়া এক বিষম দায়। কি সুখে আর এ পথে থাক্‌বো!"

হরমোহন।—"দুই পথেই সমান সুখ। কেবল বুঝবার ভুল!"

বিশ্বনাথ।—"সে কি বলেন আপনি! দেবেন আর আমি তো পাঠশালায় এক সঙ্গেই পড়েছিলাম! কেউ কখনও আমায় তার চেয়ে খারাপ বলে-নি। কিন্তু দেখুন, এক শিক্ষার ব্যবস্থার দোষে অবস্থার কি বিপর্য্যয় ঘট্‌লো! আমি কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার পাঠ শেষ ক'রে, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রধান স্থান অধিকার কর্‌লাম; আর সে ইংরেজী শিখে আইন পাশ কর্‌লো। দু'জনের দু'পথে যাওয়ার ফল তো প্রত্যক্ষই দেখ্‌ছেন! দেবেন এখন মহকুমার বড় উকিল—বড়লোক। তার কত সুখ! আর আমি!—আমার দুঃখের অবধি নাই! একটা ছেলে; তারও পড়াবার খরচ জোটাতে পার্‌ছি-নে!"

হরমোহন।—"আপনি যা বল্‌ছেন, সবই সত্য। কিন্তু বুঝ্‌তে গেলে, সবই কুহেলিকায় ঘেরা।"

বিশ্বনাথ।—"সে আবার কি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে!"

হরমোহন।—"আপনার ন্যায় পণ্ডিতের নিকট আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথাটা উঠেছে, তাই কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।"

বিশ্বনাথ।—"বলুন, কি বল্‌বার আছে?

হরমোহন।—"আপনি বল্‌লেন, সুখের জন্যই সব। কিন্তু

সুখটা কি, একটু বিচার করে দেখুন দেখি! সুখ—মনে, না, সুখ—চোখে! দেবেন বাবুর দৃষ্টান্তই ধরা যাক্। তিনি অনেক পয়সা উপার্জ্জন ক'রেছেন, স্বীকার করি। কিন্তু তিনি প্রকৃত সুখী কিনা, আপনি কি তা ব'লতে পারেন! প্রথম ধরুন—তাঁর শরীর। পায়ের গাঁটে গাঁটে প্রায়ই ফ্লানেল বাঁধা আছে; একটু ঠাণ্ডা পড়্‌লেই আর ঘরের বার হ'তে পারেন না। এদিকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ডায়েবেটিস—কত কথাই শুনি। সুখটা তাঁর কোথায় দেখ্‌লেন্! তার পর, দেশে সমাজেও তাঁর তেমন প্রতিপত্তি নেই। অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার দরুণ তাঁর সমাজে তিনি একঘরে হ'য়ে আছেন। অত বড় মেয়ে হ'ল;—আজও বিয়ে দিতে পার্‌লেন না। শুন্‌তে পাই, তাঁর পরিবার নাকি মেয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে পাগলপ্রায় হ'য়েছেন! বলুন দেখি, তাঁর সুখটা কোথায়?"

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চিন্তিত ভাবে কহিলেন,—"তা বটে! তবে পয়সায় দেবেন অনেক বড় হ'য়েছে!"

হরমোহন।—"তাই বা কি বড় হ'য়েছেন? এ সংসারে যেমন ছোটর ছোট আছে, তেমনি বড়র বড়ও আছে। পয়সা হ'য়েছে ব'লেই কি তাঁর আকাঙ্ক্ষা মিটেছে! সরকারী উকীল রমানাথ বাবু বেশী পয়সা পান; সেই জন্য, সরকারী উকীল

হওয়ার জন্য, তাঁর কত চেষ্টা—শুনেছেন তো? তবে আর সুখটা কোথায়? অভাব না থাক্‌লেই তো সুখ! অভাব যখন ষোল আনা—আকাঙ্ক্ষা যখন অপূর্ণ, তখন আর তাঁকে সুখী বলি কি ক'রে?"

বিশ্বনাথ।—"তুলনায় আমার চেয়ে দেবেন অনেক সুখী।"

হরমোহন।—"কিসে! বলুন—কিসে দেবেন আপনার চেয়ে বেশী সুখী! এই বয়সেও আপনার শরীর যুবার ন্যায় কান্তি-পুষ্টি-বিশিষ্ট। দারুণ শীতের সময়ও ঐ পাতলা ফিন্‌ফিনে চাদরটী গায় দিয়ে আপনার শীতটা কেটে যায়। আমি তো বয়সভোর দেখ্‌ছি, আপনার ব্যায়রাম-পীড়া প্রায়ই নেই। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য একটা কম সুখ নয়! এ সুখ কি অল্প-ভাগ্যের লক্ষণ।"

বিশ্বনাথ।—"শরীরটা আছে, তাই এক রকম ক'রে চল্‌ছে; নইলে যে অর্থকষ্ট!"

হরমোহন।—"অর্থকষ্টই বা আপনার কি ক'রে বলি! আহার অভাবে কোনও দিন আপনার উপবাসে কাটাতে হ'য়েছে কি? বস্ত্রাভাবে কখনও উলঙ্গ থাক্‌তে হয় কি?"

বিশ্বনাথ।—"বড়লোকেরা কত খায়—কত পরে!"

হরমোহন।—"তুলনা করেন কেন? তুলনায় কে বড়, কে ছোট, বোঝা যায় কি? রাজা তেজশ্চন্দ্র মনে করেন, তিনি কেন মহারাজ ধনুর্দ্ধর হ'তে পারেন নাই! আবার ধনুর্দ্ধর

সিংহের আকাঙ্ক্ষা—তিনি মিত্ররাজ মধ্যে গণ্য হন। সংসারের প্রত্যেক প্রাণীই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার জন্য লালায়িত। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রায় কেহই সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং সুখী বল্‌বেন—কাকে? আপনি যেমন বল্‌ছেন, দেবেন বাবুর মত অবস্থা হলে আপনার হ'তো ভাল; দেবেন বাবুও আবার তেমনি ভাব্‌ছেন,—শরীরটা ভাল থাক্‌লে আর সরকারী উকীলের মত পয়সাটা হলে হতো ভাল। এই তো অবস্থা!"

বিশ্বনাথ।—"তা বটে। কিন্তু যে অভাব!"

হরমোহন।—"অভাবের কথা আবার কেন বলেন? অভাব কার নেই?—কাঁর অভাবই বা ষোল আনা পূর্ণ হয়! তবে অভাব দু'রকমের ব'লে আমি মনে করি। এক রকমের অভাব, আপনা-আপনিই হয়; আর এক রকমের অভাব আমরা সৃষ্টি ক'রে লই। আহার, নিদ্রা প্রভৃতির অভাব-বোধ প্রকৃতিগত; প্রাণ-ধারণের জন্য আহার-নিদ্রা প্রভৃতির আবশ্যক। কিন্তু আমরা যে সব অভাব তৈরি করে লই, তার সীমা নেই। ভাল খাব, ভাল পর্‌ব,—এ আকাঙ্ক্ষার শেষ থাকে না। ডাল-ভাত খেয়েও দেহ পুষ্টি হয়; অথচ, পোলাও, কোর্‌মা, কালিয়া খাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমরা অভাব বৃদ্ধি করে থাকি। মোটা বোম্বাই চাদরেও শীত নিবারণ করা যায়; কিন্তু শাল-দোশালা ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষায় অভাব বৃদ্ধি করি। চারিদিকে এই ভাবে নূতন নূতন

অভাবের সৃষ্টি ক'রে থাকি। কুটিরে বাস করি; কিন্তু দেখি—অট্টালিকার স্বপন! সে অভাব মেটে কি কখনও! এ হিসাবে, সুখের হন্তারক দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা তো আমরা নিজেরাই!"

বিশ্বনাথ।—"তা বটে। তবে সমাজে থাক্‌তে হলে, দেশের গণ্য দশের মান্য হওয়াও তো চাই!"

হরমোহন।—"তা যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চাই বৈ কি? তবে খোদার উপর খোদকারি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা করাটা তো ভাল নয়! আপনি আছেন—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়; অপনি যদি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড হওয়ার আশা ক'র্‌তে যান, সে চেষ্টা—খোদার উপর খোদকারি ক'র্‌তে যাওয়ার চেষ্টা নয় কি?"

বিশ্বনাথ।—"ততটা আশা আর কে করে? তবে—"

হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"তবে আবার কি বলেন? আমি তো আপনার কোনই অসুখের বা অভাবের কারণ দেখ্‌তে পাই না। সম্মান যদি মানুষের সুখপ্রদ হয়, আপনি এদেশে সে সম্মানের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছেন। পূজ্য ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম, পূত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন,—আপনাকে সম্মানের উচ্চ আসন প্রদান ক'রে রেখেছে। কে না আপনার নিকট মস্তক অবনত করে? এ সম্মান-সুখ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? তার পর, আপনার অবস্থাই বা কিসে হীন? মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তো আপনার

অভাব নেই! তবে আরও বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে গেলে, সে স্বতন্ত্র কথা!"

বিশ্বনাথ।—"বাড়াবাড়িটা কি! জীবনে একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তো চাই!"

হরমোহন।—"কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, সে আকাঙ্ক্ষার সীমা থাকা আবশ্যক! বলেছিই তো, অবস্থার অনুরূপ ধীরে ধীরে প্রকৃত উন্নতির পক্ষে চেষ্টা করাই বিধেয়। সেই চেষ্টাতেই সুখ—সেই চেষ্টাতেই আনন্দ! সুখের বা আনন্দের সঙ্গে অশন-বসনের কোনও সম্পর্ক নাই। মনের সুখই সুখ—মনের আনন্দই আনন্দ।"

বিশ্বনাথ।—"কিন্তু প্রতিযোগিতার উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা না থাক্‌লে, মানুষ বড় হ'তে পারে না!"

হরমোহন।—"প্রতিযোগিতার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার আমি অন্তরায় হচ্ছি না। আমি বল্‌ছি কি, প্রতিযোগিতা ও উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে হউক না কেন? সংসারে যে অধুনা বিষম জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত, আপন-আপন গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করাই তাহার প্রধান কারণ। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ নিশ্চয়ই অনেক বিচার-বিতর্কের ও বিবেচনার পর সমাজ-বন্ধন স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির বর্ণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ নিশ্চয়ই বহু জ্ঞান-গবেষণার ফল। প্রত্যেক বর্ণ আপন-আপন বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের দ্বারাই যশোসম্মান ও প্রতিপত্তি লাভে

সমর্থ হয়। দৃষ্টান্ত অসংখ্য আছে। আপনাকে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।”

বিশ্বনাথ।—“দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্ম্ম-বিভাগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।”

হরমোহন।—“কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনই সর্ব্বনাশকর। এখন আ-চণ্ডাল ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই ইংরেজী শিখিয়া উচ্চ উচ্চ চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় চাকরীর সংখ্যা কয়টি? সুতরাং সকলের ভাগ্যে চাকরী মিলিতেছে না! কাজেই অসন্তুষ্টি-হেতু সমাজে ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। আপনি স্মৃতিরত্ন মহাশয়; আপনার পুত্রও চাকরীর জন্য ছুটিয়াছে! আমি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; আমার পুত্রও হয় তো কোন্ দিন সে আকাঙ্ক্ষা করিবে! কি যে অধঃপতন হইল—সমাজের।”

বিশ্বনাথ।—“আমরা বলি অধঃপতন। কিন্তু অন্যান্য জাতিরা—শিক্ষিত জনসাধারণ—এ পরিবর্ত্তনে বরং উন্নতির লক্ষণই দেখ্‌তে পান।”

হরমোহন।—“হাঁ, ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি বলে বটে, তাদের অনেক অধিকার ব্রাহ্মণেরা খর্ব্ব ক'রে রেখেছে। কিন্তু সেটা তাদের ভ্রম। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মগুণে আপন আপন সমাজে বড় হ'তে পারে। আবার আপন সমাজে বড়

হ'তে পার্‌লেই অন্য সমাজেও তার উচ্চ আসন আপনা-আপনিই হ'য়ে পড়ে। আজকাল অন্ত্যজ জাতির উদ্ধারের জন্য একটা আন্দোলন উঠেছে, শুন্‌তে পাই। কিন্তু কে কার উদ্ধারকর্ত্তা! আপন-আপন জাতি-ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া তাহারা সমাজে যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, এখন তাঁর শতাংশের একাংশও আছে বলিয়া মনে হয় না। দুই এক জন দু'চার পাত ইংরেজী শিখে সভ্য বলে পরিগণিত হচ্ছে বটে; কিন্তু তারাও যে তাদের অশিক্ষিত জাতিভাইকে সমাদর ক'রে, তা আমার মনে হয় না। আপনাদেরই গ্রামের হরেকৃষ্ণের কথাটা ধরুন না! ইংরেজী শিখে, জাতভাই ত্যাগ ক'রে, সে শেষে ব্রাহ্ম হ'য়ে গেল! শুনেছি, তার মেয়ের বিয়ের পাত্র পেল না বলেই সে আপন সমাজ ত্যাগ ক'রে গেল।"

বিশ্বনাথ।—"হাঁ, তা বটে! তাদের জাতের মধ্যে সব অশিক্ষিত, কাজেই তাকে—"

হরমোহন বাধা দিয়া কহিলেন,—"কিন্তু আপন আপন বৃত্তি পালনে যারা বড় হয়েছিল, তারা কি হরেকৃষ্ণ প্রভৃতির চেয়ে কম সম্মান-ভাজন ছিল? ঐ হরেকৃষ্ণের বাপ তিনু সর্দ্দারকে আমার বাবা 'তিনু দাদা' বলে কতই আদর ক'র্‌তেন! তার মানটা কি এর চেয়ে কম ছিল? এই হরেকৃষ্ণ যে সমাজে গিয়েছে, তারাই বা কিসের খাতির করে। একটু তলিয়ে দেখ্‌তে গেলে, সে তার

পয়সার খাতির!" যাই হোক, অমলের সম্বন্ধে আপনার এ ব্যবস্থা করাটা, আমার মতে, ভাল হয়-নি।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—"নিতান্ত নিরুপায়! কাজেই—"

হরমোহন।—"নিরুপায়টা যে কি, আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাই-নে! লোকের যখন চাকরী ছিল না, তখনও তো উপায় ছিল! এখনই আমরা সব বেঁচে আছি, আর তখনই কি সব মরে ছিল? তখন এই আমাদেরই গ্রামে কতগুলো দুর্গোৎসব হতো! কত পাল-পার্ব্বণের কত আনন্দ ছিল! কিন্তু এখন সে তুলনায় গ্রাম শ্মশান। গ্রামের অনেকে বড় বড় চাকরী করেন, অনেকে বড়লোক হ'য়েছেন শুন্‌তে পাই; কিন্তু তাঁদের কারও সে ক্রিয়া-কর্ম্ম আর দেখি না। পল্লীগ্রাম যদি থাক্‌তো, সমাজ যদি বিধ্বস্ত না হ'ত, তাহ'লে আর এ কষ্ট সইতে হ'ত না—এ বিশৃঙ্খলা ঘট্‌ত না। আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুড়ুল মার্‌ছি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সময় নরেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। তখনকার মত সে আলোচনা স্থগিত রহিল। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, নরেন্দ্র, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ও পিতার চরণে প্রণত হইল।

হরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, অমল কৈ?"

নরেন্দ্র।—"অমল এখানে নেই। প্রফেসার সার্দ্দার সঙ্গে পরশু সন্ধ্যার সময় সে কলম্বো গিয়েছে।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়-বিহ্বলভাবে কহিলেন,—"সে কি!—কলম্বো গেল কি!"

নরেন্দ্র।—"আজ্ঞে হাঁ। আমি তার বাসায় খুঁজতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুন্‌লাম,—মিঃ সার্দ্দা তাকে কলম্বো নিয়ে গিয়েছেন।"

স্মৃতিরত্ন।—"বিমলও গিয়েছে নাকি?"

নরেন্দ্র।—"না। মিঃ সার্দ্দা তাকেই পসন্দ করেছেন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়।—"হাঁ—হাঁ মনে হচ্ছে বটে। আমাকে

অধ্যাপক সার্দ্দার বিষয় অমল একখানা চিঠি লিখেছিল বটে। সার্দ্দা একজন ভারি পণ্ডিত—নয়?"

নরেন্দ্র।—"হাঁ। পাশ্চাত্য-দর্শনে তাঁর মত পণ্ডিত লোকের নাম আজ কাল খুব কমই শুনা যায়।"

স্মৃতিরত্ন।—"হাঁ—হাঁ, আমায় তাও লিখেছিলো বটে। সার্দ্দা নাকি তাকে খুব ভালবাসেন;—তাকে নাকি বড় যত্ন করেন!"

নরেন্দ্র।—"হাঁ, মিঃ সার্দ্দার খুব সুনাম আছে। তিনি ছাত্র-দের বড় যত্ন করেন। অনেক ছেলের অনেক পড়ার খরচ পর্য্যন্ত যুগিয়ে থাকেন। তিনিই তো জাহাজের খরচা দিয়ে অমলকে নিয়ে গিয়েছেন। শুনেছি, ছাত্রদের প্রতি তাঁর এমন যত্ন যে, তিনি যেমন ফাষ্ট ক্লাস কেবিনে থাক্‌বেন, ছাত্রকেও সেই রকম কেবিনে আপনার কাছে রাখ্‌বেন। খাওয়া-দাওয়া—যেমন নিজে খাবেন, তেমনি ছেলেদেরও খাওয়াবেন। ছাত্রদের জন্য টাকা খরচ কর্‌তে তিনি একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রফেসার সার্দ্দার মত অমায়িক লোক আজকাল বড় দেখা যায় না।"

'জাহাজে!'—কথাটা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে যেন আঘাত করিল। 'জাহাজে'!—'সমুদ্রপথে!'—'বিলেত ফেরত অধ্যাপক সার্দ্দার সঙ্গে!' 'সে যা খাবে, তাই খাওয়াবে!'

স্মৃতিরত্ন মহাশয় আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল।

হরমোহন এতক্ষণ নীরবে সকল কথাই শুনিতেছিলেন। এক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"শেষ এই হ'ল!"

বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি মনে মনে কহিলেন,—"একজন বিলেত-ফেরত আধা-সাহেবের সঙ্গে স্মৃতিরত্ন-মহাশয়ের পুত্র সমুদ্র-পথে গেল!" প্রকাশ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি ছিল?"

বিশ্বনাথ।—"না। আমাকে তো সে এ সব কথা কিছু লেখে-নি! তবে আমি এ কয় দিন বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনও চিঠিপত্র গিয়ে থাকে।"

হরমোহন বিশেষ চিন্তান্বিত স্বরে কহিলেন,—"তাই তো! আপনার অনুমতি না নিয়ে গেল!"

এই সময় নরেন্দ্র কহিল,—"অধ্যাপক সার্দ্দার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেক ছেলে উৎসুক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে অমলকেই পসন্দ ক'রে নিলেন। এই অল্প দিনেই কলেজে অমল একটা খুব ভাল ছেলে বলে গণ্য হয়েছে।"

পুত্রের মুখে অমলের এবম্বিধ প্রশংসাবাদ শুনিয়া, হরমোহনের মনটা একটু দমিয়া গেল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"আমার নরেনও দেখ্‌ছি, ঐ গৌরবকেই একটা গৌরব ব'লে মনে কর্‌তে শিখেছে। কি যে হবে!"

পুত্রের পড়াশুনা বিষয়ে প্রশংসাবাদ শুনিয়া বিশ্বনাথের

মনে আনন্দ হইল বটে; কিন্তু সে যে জাতি-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া, কলম্বো চলিয়া গেল, তজ্জন্য তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না।

অনেক ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে হরমোহন কহিলেন,—"যদি দু'দিন আগেও জান্‌তে পার্‌তাম—"

নরেন্দ্র আরও কহিল,—"কলম্বো সহরে ভারি ধুম! দেশ-বিদেশের দার্শনিকগণ সেখানে সমবেত হবেন। সেখানে 'রিলিজিয়াস কংগ্রেস' ব'স্‌বে;—ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার জন্য সেখানে মহাসভার অধিবেশন হ'বে। কত নূতন নূতন তত্ত্বের আলোচনা চ'ল্‌বে। সে কংগ্রেসে যারা যেতে পারে, তাদের খুব সম্মান!"

পুত্রের শেষ কথা শুনিয়া হরমোহনের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তিনি সে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন; ইঙ্গিতে নরেন্দ্রকে অনুসরণ করিতে কহিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আর কিছুই ভাল লাগিল না। সেই দিনই তিনি বাড়ী রওনা হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—— * ——

হরমোহন গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরেন, তোর কি মনের ভাব—বল দেখি।"

পিতার রোষ-ব্যঞ্জক প্রশ্নে নরেন্দ্রের হৃদয় দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে নীরবে অধোবদনে পিতার চরণ-প্রান্তে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরমোহন পূর্ব্ববৎ রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"তুই কি মনে ক'রে-ছিস্, বল দেখি? তুই কোন্ বংশের সন্তান;—সব ভুলে গেলি। তোর প্রতি যে আমার বড় আশা ছিল।"

নরেন্দ্র তথাপি কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

হরমোহন অধিকতর রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"চুপ ক'রে রইলি যে? প্রফেসার সার্দ্দার সঙ্গে কলম্বোর কংগ্রেসে যাওয়া বড় গৌরবের বিষয়—নয়!"

নরেন্দ্র কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি তো তা বলি-নি।"

হরমোহন।—"তোকে যদি সার্দ্দা সাহেব ঐ রকম আদর ক'রে নিয়ে যেত, তুই তাহ'লে যেতিস্ তবে? বড় সম্মান বাড়্‌তো নয়!"

নরেন্দ্র পূর্ব্ববৎ মৃদু-স্বরে কহিল,—"আমি তো সে কথা বলি-নি। আমি তাঁর সঙ্গে কেন যাবো? আমি কেন সে গৌরবকে গৌরব বলে মনে ক'র্‌বো? অন্যান্য ছাত্রেরা যা বলে, সাধারণ লোকে যা ব'লে থাকে, আমি সেই কথাই বলেছি মাত্র। বল্‌তে হয় তো ঠিক পারি-নি; কিন্তু আমার মনের ভাব কখনই অমন হবে না।"

হরমোহনের বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন মুখে যেন আনন্দের বিদ্যুৎরেখা প্রকাশ পাইল। হরমোহন কহিলেন,—"তোর কথা শুনে আমার মনে হ'য়েছিল, তুইও বুঝি ঐ গৌরবকেই গৌরব ব'লে মনে করিস্।"

নরেন্দ্র।—"না, আমি কদাচ তা মনে করি না!"

হরমোহন।—"আমি কিন্তু তোকে আবারও সাবধান করে দিচ্ছি,—কদাচ এ ভাব যেন তোর মনে না আসে! তোকে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়েছি, দর্শনাদি পড়িয়েছি। তার পর ইংরেজী শিখ্‌তে দিয়েছি। কিন্তু তোকে কখনও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে শিক্ষা দিই নাই। তুই যখনই যে কাজ কর্‌বি, মনে রাখিস্, তোর পিতৃ-পিতামহগণের পুণ্য-স্মৃতি! মনে রাখিস্, সে স্মৃতি কিসে উজ্জ্বল হয়! আপন সমাজ, আপন জাতি, আপন ধর্ম্ম যাহাতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়, সকলেরই সেই বিষয়ে চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। নিজের সমাজ, নিজের জাতি, নিজের

ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, অপরের ধর্ম্মে, অপরের জাতিতে, অপরের সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। তোকে বাল্যকাল থেকে এই কথাই বুঝিয়ে আস্‌ছি। খুব সাবধান! কদাচ যেন পদস্খলন না হয়! শাস্ত্রের কথা তুই সব শিখেছিস্। নিজের সমাজ নিজের ধর্ম্ম যদি হীনও হয়, কখনও তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। আর অপরের সমাজ অপরের ধর্ম্ম যদি শ্রেষ্ঠও হয়, তাহাও কদাচ গৃহীতব্য নয়। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে সকলে অগ্রসর হউক, সকলেই পিতৃ-পিতামহ প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করুক—মনে রাখিস্—এই শিক্ষাই সার শিক্ষা!"

নরেন্দ্র।—"আপনার এ উপদেশ আমার হৃদয়ে-হৃদয়ে গাঁথা আছে।"

হরমোহন।—"তবে একটা খট্‌কা মনে আস্‌তে পারে। সেটাও বেশ ক'রে বুঝে রাখা উচিত। আগেও এ সব কথা তোকে বলেছি, আবারও বল্‌ছি। কেউ কেউ বল্‌তে পারে, যদি আমার এমনই মত, তবে তোকে কলেজে ইংরেজী পড়্‌তে দিলাম কেন? তারও উদ্দেশ্য আছে। তুই চাক্‌রী করবি বলেই যে তোকে ইংরেজী শিখ্‌তে দিয়েছি, তা নয়। জ্ঞানের—বিদ্যার শেষ নাই। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যখন সংস্রব ঘটেছে, তখন উভয়ের জ্ঞানেই জ্ঞানবান হওয়া আবশ্যক ব'লে

মনে করি। প্রাচ্যের অনেক বিদ্যা পাশ্চাত্যে কি ভাবে পরিগৃহীত হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌লে অনেকটা উপকার আছে। এইরূপ নানা কারণে তোকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌ছি। কিন্তু তাই ব'লে জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। সমাজকে দেখাতে হবে,—আপন সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করেও কেমনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়;—কেমনভাবে স্বদেশের স্বজনবর্গের হিতসাধনে সামর্থ্য আসে।"

নরেন্দ্র।—"কেহ কেহ বলেন, ইংরেজ আমাদের দেশের রাজা। তাঁদের হাবভাব গ্রহণে তাঁদের সঙ্গে মেশামিশি না কর্‌লে চলে না।"

হরমোহন।—"রাজার প্রতি সম্মান দেখান, অবশ্যই কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। কিন্তু আমার মনে হয়, জাতি-ধর্ম্ম খুইয়ে তাঁদের হাবভাব গ্রহণে যত্নবান হ'লে, সে সম্মান যোলআনা দেখান যায় না। তাঁরাও যে তাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন, তাও মনে করি না। তাঁদের হাবভাব বা চাল-চলন গ্রহণ কর্‌লে মনে একটা অন্যভাব আসে। তা হ'লে রাজা বা রাজপুরুষ ব'লে একটা ভক্তিভাব থাকে না। কিন্তু হিন্দু যদি হিন্দু থাকে; হিন্দুর যে চক্ষে রাজাকে দেখা আবশ্যক, হিন্দু যদি সেই চক্ষে রাজাকে দেখে, তা হ'লে সকল দিকে সুশৃঙ্খলা থাকে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে এবং

পাশ্চাত্যের অনুসরণে এ দেশে যে একটা উচ্ছৃঙ্খলার রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, তার কারণ কি? অনেকেরই সমান হবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যে প্রকৃত হিন্দু, তার মনে সে আকাঙ্ক্ষা আসে না। সে জানে, কর্ম্মগুণে জনে জনে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে। আমরা যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, নিশ্চয়ই জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে। আবার যিনি আমাদের সম্রাট হ'য়ে জন্মেছেন, তাঁরও সে সম্রাট-পদপ্রাপ্তি—জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মের ফল। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে বিশ্বাসবান্ থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে কোনই অশান্তির সম্ভাবনা থাকে না। যে যেমন, তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার কর্‌বে। মিশ্‌তে হবে—সকলের সঙ্গেই; কিন্তু থাক্‌তে হবে—নির্লিপ্ত ভাবে। লক্ষ্য রাখ—স্বজনের স্বসমাজের স্বগ্রামের স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে। সেই লক্ষ্য রেখে সুশিক্ষার পথে অগ্রসর হও। উচ্ছৃঙ্খলা যেন কখনও এসে নখস্পর্শ কর্‌তে না পারে!"

নরেন্দ্র নীরবে নতমুখে পিতার চরণ-প্রান্তে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—"ভগবন, আমায় সেই শক্তি দাও;—যেন বংশের মুখ উজ্জ্বল কর্‌তে পারি;—যেন পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়!"

দশম পরিচ্ছেদ।

ছুই মাস পরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় এক পত্র পাইলেন। পুত্র অমলচন্দ্র কলম্বো হইতে সেই পত্র লিখিয়াছে। পত্রে কত কথাই লেখা আছে। সমুদ্র-যাত্রায় আনন্দের কথা! নূতন সহরের নূতন মনুষ্য-সমাজ দেখিয়া আনন্দের কথা! উপসংহারে, আপনার ভবিষ্য আশা-ভরসায় আনন্দের কথা! সে কত কথাই লিখিয়াছে।

সে লিখিয়াছে,—

"বড় সৌভাগ্য-বলে আমি প্রফেসার সার্দার প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছি। তাঁর অনুগ্রহ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ এক স্বপ্নের অতীত কল্পনার অতীত রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। রামায়ণে রাবণ-রাজার সোণার লঙ্কার কথা পড়িয়াছিলাম। কথকতায়, যাত্রায়—কত রকমেই সে বিষয়ে কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছিল। আজ সেই রাবণ রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

"সোণার লঙ্কার এখন আর সে শ্রী-ছাঁদ নাই। এখানকার লোকে এখন সে পুরাতন কথা কিছুই বলিতে পারে না। হয় তো কেহ বলিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সহিত আমার মেলা-মেশা এখনও হয় নাই। সুতরাং সে তথ্য অবগত হইবার সুবিধাও কিছু পাই নাই। রাক্ষসের দেশে সে রাক্ষসের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অথবা, তাহারা কোথাও লুকাইয়া পড়িয়াছে; তাই তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন আর রাবণের লঙ্কায় রাক্ষসের বিভীষিকাও কেহ দেখিতে পায় না। এখনকার যে লঙ্কা, সে লঙ্কার বর্ণনা পরে আপনাকে লিখিয়া জানাইব।

"আপাততঃ আজ একটা বড় সুবিধার কথা আপনাকে জানাইতেছি। বোধ হয়, আমার পড়ার খরচ-পত্র আপনাকে আর কিছুই যোগাইতে হইবে না। প্রফেসার সার্দ্দা আমেরিকার চিকাগো সহরে যাইতেছেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহেন। সেখানে আমার লেখাপড়া শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন, বলিয়াছেন। আমেরিকার মার্কিন-রাজ্য অধুনা জ্ঞান-গৌরবে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত। সেখান হইতে শিক্ষা পাইয়া যদি আমি এদেশে আসিতে পারি, আপনাদের সকল অভাব দূর করিতে পারিব। আমার বাসার খরচ কলিকাতায় আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। বোধ হয়,

আর এক সপ্তাহ পরেই আমরা কলম্বো হইতে আমেরিকায় রওনা হইব। আমাকে পত্র দিতে হইলে, 'পি ও এন' কোম্পানীর 'কলম্বিয়া' জাহাজের কাপ্তান সাহেবের কেয়ারে পত্র দিবেন। আমার জন্য আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মার্কিন রাজ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, শীঘ্রই আপনাদের শ্রীচরণ-দর্শনে সমর্থ হই।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বুক শুকাইয়া গেল। হৃদয়ের মধ্যে ঘন ঘন স্পন্দন উপস্থিত হইল।

"হায়—হায়!—কি হইল!" বলিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী জয়দুর্গা দেবী, অমলের পত্র আসিয়াছে শুনিয়া, ত্বরিত-পদে পতির নিকট আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার অমলের পত্র এসেছে নয়? অমল আমার ভাল আছে তো!"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরে করাঘাত করিলেন। গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"কি, কি—কি, হয়েছে! তবে কি কোনও অমঙ্গলের সংবাদ এয়েছে?"

বিশ্বনাথ সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"স্থির হও! তুমি অমন কর্‌ছ কেন? কি হবে—অমলের? সে নিজে হাতে চিঠি লিখেছে—এই দেখ!"

গৃহিণী কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন,—"তবে তাঁর

তো কোনও অসুখ-টসুখ করে-নি! বল—বল, কি হয়েছে? তুমি অমন কর্‌লে কেন?"

স্মৃতিরত্ন।—"হবে আবার কি? অসুখ কর্‌বে কেন?"

গৃহিণী।—"তবে তুমি অমন কর্‌ছিলে কেন?"

স্মৃতিরত্ন।—"সে কথা আর কি ব'ল্‌বো তোমাকে! আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।"

গৃহিণী উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হয়েছে কি ছাই!—খুলেই বল না কেন?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশে কহিলেন,—"হবে আর কি? হ'য়েছে—আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমার অদৃষ্টে এই ছিল!

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হ'লো? কেন তুমি অমন ক'র্‌ছো! কোনও অমঙ্গলের সংবাদ আসে-নি তো!"

স্মৃতিরত্ন।—"অমঙ্গল ষোল আনা!"

গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা—এঁ্যা! কি হ'লো গা!

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"স্থির হও!—স্থির হও! অমল মরে-নি!—মরে নি! সে মরে-নি; কিন্তু আমার সে মেরে গেছে!"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, একে একে সকল কথা বুঝাইয়া, বলিলেন,—"অমল যত বড় লোক হইয়াই ফিরিয়া আসুক না কেন, তাঁহারা আর তাহার জলগণ্ডূষ লাভের অধিকারী নহেন।"

মার প্রাণ, যতই বিচলিত হউক না কেন, অমল কুশলে আছে বুঝিয়াই আশ্বস্ত হইল। মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া গৃহিণী কহিলেন,—"মা মঙ্গলচণ্ডী আমার অমলের মনস্কামনা পূর্ণ করুন। অমল আমার একটা দিগ্‌গজ লোক হ'য়ে দেশে ফিরে আসুক।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটু ক্রুদ্ধ হইয়া, মুখবিকৃতি করিয়া, কহিলেন,—"বড় তাতে মুখটা উজ্জ্বল হবে—নয়!"

গৃহিণী।—"কেন, তুমিই তো বল্‌তে, কত টাকা—কড়ি উপার্জ্জন ক'রতে পার্‌বে—কত বড় লোক হবে! তুমি দেবেন বাবু দেবেন বাবু কর। তা হলে দেবেন বাবু টেবেন বাবু সব তল পড়ে যাবে তো?"

স্মৃতিরত্ন।—"সাধ ক'রে কি আর বলে, মেয়ে মানুষের বুদ্ধি! টাকা হ'লেই কি সব হ'ল? জাত গেল যে!"

গৃহিণী।—"তাই ব'লে কি ছেলেকে ত্যাগ ক'রতে হবে! অন্য সময় কত জনের কত কাজে কত বিধান দিতে পার;—কত ছেঁড়া পুঁথিপত্র ঘেঁটেঘুঁটে কত কি মাথামুণ্ডু বের ক'র্‌তে পার! আর আপনার ছেলের বেলায় কি একটা বিধান-টিধান বেরুবে না!"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"যা ক'র্‌বার করেছি। ফলভোগও তার কর্‌ছি। হে ভগবন্! আর যেন অধিক কিছু ক'র্‌তে প্রবৃত্তি না হয়।"

* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। বিমল পাশের পর পাশ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মধ্যে মধ্যে অমলের নিকট হইতেও এক একটা টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। কোনও টেলিগ্রামে খবর আসিল,—অমল রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কখনও বা টেলিগ্রাম আসিল,—সে কৃষি-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা দেখাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছে। সময় সময় সংবাদ-পত্রেও অমলের কৃতিত্ব-কথা বিঘোষিত হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসরে কত পরিবর্ত্তনই সাধিত হইল! বিমল ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়া পিতার বাসায় পিতার সঙ্গে ওকালতী ব্যবসায় শিখিতে আরম্ভ করিল। নরেন্দ্র প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া, মেডেল বৃত্তি প্রভৃতি পাইয়া, ছাত্র-জীবনের শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

অমলের পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া অধ্যাপক সার্দ্দা তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাথেয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু অমল দেশে ফিরিতে চাহিল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া, দেশের কাজ করিবার জন্য, অধ্যাপক সার্দ্দা তাহাকে পুনঃপুনঃ পত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা ওজর-আপত্তি জানাইয়া সে কালবিলম্ব করিতে লাগিল। আর কেবলই একটা-না-একটা ছুতা-নাতা ধরিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল।

পুনঃপুনঃ এক একটা অছিলা করিয়া টাকা চাহিয়া পাঠানয় অধ্যাপক সার্দ্দার মন একটু বিচলিত হইল। অবশেষে তিনি চিকাগো সহরে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু সে পত্রের উত্তরে তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

"এমন ছেলে এমন হ'লো! পুত্রের অধিক স্নেহে তাকে লেখাপড়া শেখালাম্! তার পাছে অজস্র অর্থ ব্যয় কর্‌লাম! শেষ ফল এই হ'লো! লোকে আমাকেই বা কি ব'ল্‌বে? ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র!—কত আশা-ভরসার স্থল! শেষে তার এই পরিণাম ঘট্‌লো! এ যে আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই!"

সার্দ্দার একবার মনে হইল,—"তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে পত্রে যে সব কথা লিখিয়াছেন, সে সব কথা সত্য নহে। তিনি হয় তো কি শুনিতে কি শুনিয়া কি লিখিয়াছেন!"

আবার তাঁহার মনে হইল,—"না—না, তিনি তো তেমন লোক নন্। তিনি কখনও বাজে কথা লিখিতে পারেন না। নিরীহ নির্দ্দোষ যুবকের উপর তিনি যে অকারণ দোষারোপ করিবেন, এ প্রকৃতি তাঁর কখনই নয়!"

"তবে এ কি হ'লো! শান্ত শিষ্ট মেধাবী ছাত্র দেখে, তার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ক'রে, আমি তার উচ্চতর উচ্চতম শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছিলাম! এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো! তার বাপ-মা কি ব'লবে, দেশের দশ জন কি মনে ক'রবে! আমা হ'তে শেষে এই হ'লো! বন্ধু যা লিখেছেন, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তার ইহজীবনের আশা-ভরসা সব লোপ পেয়ে গেল! আমি কি ক'রতে, এ কি ক'রলাম্।"

"সামান্য একখানা বিস্কুট খেতে হ'লে যার মুখ বেঁক্তো, সে এখন ঘোর মাতাল! কত বার কত টাকা-কড়ি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তার সততার একটুও ব্যতি-ক্রম দেখ্তে পাই নাই; সে কিনা আজ চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী! পরস্ত্রীর মুখপানে যে কখনও চাইতো না—আমি তাকে কত বার কত রকমে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি—সেই সুশীল সচ্চরিত্র অমল আজ লাম্পট্যদোষ-দুষ্ট! কি ক'রতে কি হ'লো! সংসর্গ দোষে সব ঘটে। আমি বুঝেও তা' বুঝ্তে পার্লেম না!"

অধ্যাপক সার্দ্দা আর ভাবিতে পারিলেন না। কেন এমন হইল, কি দোষে এমন হইল, তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। তাঁহার দ্বারা যে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, সেই অনুশোচনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে আবার তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, কি করিলে আবার তাহাকে ফিরাইতে পারা যায়, এবম্বিধ নানা চিন্তায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল। অমলকে পুনরায় দেশে আনিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিতে পারেন, অধ্যাপক তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

কলিকাতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের জীবন অনুশোচনার তীব্র দংশনে বিষম ব্যথিত হইয়া উঠিল। জীবনে সেই তাঁহার প্রথম অনুশোচনা! তার পর, কলম্বো হইতে অমলের প্রেরিত সেই পত্রখানি যখন তাঁহার হস্তগত হইল, সে অনুশোচনার দংশন তীব্রতর অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে সে অনুশোচনায় ব্রাহ্মণ পাগলপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে—সকল সময়েই তাঁর মনে হইতে লাগিল,—'হায়, আমি কি করিতে কি করিলাম!' মনে পড়িতে লাগিল,—হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ-সমূহ! মনে পড়িতে লাগিল,—তিনি যে বলিয়াছেন,—'সংসর্গ দোষই প্রধান দোষ! সেই কথাই সত্য!' মনে হইতে লাগিল,—'সে দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন আসিল।'

মন ভাঙ্গিল। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। অমন যে সুকান্তি সুষ্ঠু সুপুরুষ, দিনে দিনে যেন শুখাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন বৈকালে শরীর একটু

একটু গরম হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে দিকে আর দৃক্‌পাত করিলেন না।

এক দিকে দেহের ও মনের এই অবস্থা; তাহার উপর অন্য দিকে আবার গৃহিণীর দারুণ গঞ্জনা!

স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। শুশ্রূষার সেরূপ ব্যবস্থা হইল না; ঔষধ-পথ্যের কথা কহিতে গেলে, তিনি অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অমলের চরিত্র-দোষের সংবাদ ব্রাহ্মণের কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। অসৎকর্ম্ম আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাহারও সামান্য একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে নিন্দকের রসনায় তাহা বিকট বিভীষিকাময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সে ক্ষেত্রে, অমল যখন সত্য-সত্যই কুচরিত্র কদাচারী হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর সে কথা কি কখনও ঢাকা থাকে? কোথায় কোন্ দূর দেশে মার্কিন-রাজ্যে অমল কি কুকর্ম্ম কদাচার করিয়াছিল, বাঙ্গালার নিভৃত নির্জ্জন পল্লীগৃহে নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া সেই সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল।

রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন সেই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রাণের ভিতর দারুণ শেল বিদ্ধ হইল। তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে তিনি ভগবানকে ডাকিলেন,—"হে বিধাতঃ!

এখনও কি আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ হয় নাই! এই সকল মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে হইবে বলিয়াই কি আমায় জীবিত রাখিয়াছ? হে দেব! অপরাধ ক্ষমা কর,—আমায় শীঘ্র শীঘ্র তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দেও! আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার বাঁচিতে সাধ নাই। এক মুহূর্ত্তকে এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। উঃ!—কি যন্ত্রণা! জ্বলে গেল!—জ্বলে গেল!"

"বড় জ্বালা!—বড় জ্বালা!"—বলিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৃহিণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিলেন। দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন,—"কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে?—কেন অমন কর্‌ছো? কি যন্ত্রণা হচ্ছে, আমায় বল! আমি এখনই আবার কব্‌রেজ ডাক্‌তে পাঠাচ্ছি।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আর ক'ব্‌রেজ ডাক্‌তে হবে না! আমার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে না; আমি বেশ ভাল আছি।" মনে মনে কহিলেন,—"গৃহিণী! কবিরাজ ডাকিতে বলিতাম, কবিরাজ আসিয়া যদি আমায় একটু বিষ দিত, আর সে বিষ খাইয়া এখনই আমার প্রাণ বাহির হইত! কিন্তু কবিরাজ তো সে বিষ দিবে না! তবে আর দরকার কি?"

গৃহিণীর আকুলি-ব্যাকুলি দেখিয়া, হৃদয়ের যন্ত্রণা হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয় ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন।

কিন্তু সে নীরবতা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। যেন আপনা-আপনিই তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল,—"হায়!—আমার অদৃষ্টে এই ছিল? আসন্নকালে পুত্রের জলগণ্ডূষেরও ভাগী হইলাম না!"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মুখে অমলের সম্বন্ধে ঐরূপ আক্ষেপের কথা শুনিয়া মার প্রাণ আবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আবার উচ্চৈঃ-স্বরে 'অমল অমল' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কান্নার স্বর শুনিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অবস্থান্তর মনে করিয়া, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা সকলেই অমলের জননীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এক জ্ঞাতি-ভাই কহিলেন,—"আমি কাল ক'ল্‌কাতা থেকে এসেছি। আপনারা অত উতলা হচ্ছেন কেন? অ' ল ভাল আছে, সে কল্‌কাতায় এসেছে। সে হয় তো শীগ্‌গীরই বাড়ী আস্‌বে।"

"এ্যাঁ!—এ্যাঁ, অমল ফিরে এসেছে!"—স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"আমার মুখটা তবে দেখ্‌ছি ভাল রকম ক'রেই পুড়্‌বে! হায়!—হায়!—এখনও কেন আমার মরণ হ'লো না!"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অবস্থান্তর উপলব্ধি করিয়া সকলে তাঁহার সুশ্রূষার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রনাথ এখন দেশ মধ্যে সম্মানার্হ ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। কি জনসাধারণ, কি রাজপুরুষগণ,—সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার সংশ্রব আছে; সকলেরই দায়-দৈবে বিপদ-আপদে তিনি যথা-সামর্থ্য সহায়তা করিয়া থাকেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত ও দেশের সম্মানার্হ ব্যক্তি বলিয়া গবরমেণ্ট তাঁহাকে দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের উচ্চ বিচারপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কি সামাজিক, কি রাজনৈতক,—সকল বিষয়েই তাঁহার মত অধুনা সমাদৃত হইয়া থাকে।

পূজার ছুটির পর হাইকোর্ট খুলিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ বিচারালয়ে বিচারপতির সম্মানীয় আসনে সমাসীন। প্রথমেই আজ তাঁহার নিকট এক অভিনব মামলা পেশ হইল।

মিস্ ডেনি—চিকাগো সহরের এক চর্ম্মকারের কন্যা। তাহার

পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং উপযুক্ত ঘরে উপযুক্ত বরে তাহার বিবাহ হয় নাই। দেখিতে সে সুন্দরী ছিল। কিন্তু সে সহরে তাহার সে রূপের তেমন আদর হয় নাই।

চিকাগো সহরে পড়িতে গিয়া অমল প্রথমে এক হোটেলে বাসা করিয়া ছিল। মিস্ ডেনি সেই হোটেলের পরিচারিকার কার্য্য করিত। সেই সূত্রে ডেনির সহিত অমলের পরিচয় হয়। সে পরিচয় ক্রমে গুপ্তপ্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। প্রথমে গোপনে গোপনে প্রেমাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল। পরিশেষে কাণা-কাণি জানাজানি হইলে, মিস ডেনির পিতা ডেনির সহিত অমলকে বিবাহে বাধ্য করেন। সেই বিবাহ-ব্যাপারে অমলকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। পড়িবার জন্য অধ্যাপক সার্দ্দা যে খরচ-পত্র পাঠাইতেন, এই সময় হইতে ডেনির বাপের হাতে অমল তাহা মাস মাস প্রদান করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে হোটেলের বাসা উঠিয়া যায়। পড়াও বন্ধ হয়। পরিশেষে অমলকে ডেনির পিতার কারবারে—চর্ম্মকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়।

এই অবস্থায় কাল কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক সার্দ্দা অমলের চরিত্র-দোষের সংবাদ জানিতে পারেন। সুতরাং তিনি পড়ার ব্যয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। যখন দেশ হইতে টাকা যাওয়া বন্ধ হইল, তখন অমলের প্রতি ডেনির পিতা বিরূপ হইয়া উঠিলেন। অমলের প্রতি ডেনিও আর পূর্ব্ব-

রূপ অনুরাগ প্রদর্শনে সমর্থ হইল না। মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় অমল কাজকর্ম্মেও তাদৃশ পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। ডেনির পিতা তখন অমলকে আপন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

দেশ-মাহাত্ম্যে এবং সংসর্গ-দোষে অমল অনেক গুণে গুণবান হইয়া উঠিল! পূর্ব্বেই মত্তপানে অভ্যস্থ হইয়াছিল। মদ খাইয়া উন্মত্ত অবস্থায় সে এক দিন ডেনির পিতার দোকান আক্রমণ করিল। ফলে, ডেনির পিতা তাহাকে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত করিলেন। নিঃসহায় নিরুপায় অমল কোনই তদ্বির করিতে পারিল না। বিচারে তাহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইল। সেই সময় অধ্যাপক সার্দ্দার সহিত চিকাগো সহরস্থিত তাঁহার বন্ধুর পত্রালাপ চলিয়াছিল। সেই পত্রে অমলের দুর্দ্দশার সংবাদ অবগত হইয়া অমলকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সার্দ্দা তাঁহার বন্ধুর নিকট কিছু টাকা পাঠাইয়া দেন।

সার্দ্দার প্রেরিত সেই টাকার সাহায্যে, অমল এখন কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াও তাহার অব্যাহতি নাই। সেও আসিয়াছে, আর তাহার পাছে পাছে বিবি ডেনিও আসিয়া পৌছিয়াছে। দেশ হইতে পাথেয় যাওয়ায়, অমলের দেশের অবস্থা ভাল মনে করিয়া, বিবি ডেনি তাহার অনুসরণ

করিয়াছিল। তাহারই ফলে, অমলের নামে খোরপোষের দাবীতে বিবি ডেনি হাইকোর্টে নালিশ রুজু করিয়াছে।

পূজার ছুটির পর হাইকোর্ট খুলিবা মাত্র নরেন্দ্রনাথের এজলাসে ডেনির সেই মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ডেনি আর্জিতে লিখিয়াছে,—"অমল তাহাকে বিবাহ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। সে এখন এখানে আসিয়া শুনিয়াছে, অমলের আর এক বিবাহ আছে। সুতরাং অমল প্রতারণা করিয়া স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহাকে বিবাহ করার জন্য দুই বিবাহের অপরাধে অপরাধী। আর, এ ক্ষেত্রে অমল তাহার খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য।"

ডেনির ব্যারিষ্টার অমলের চরিত্র সম্বন্ধে কত কথাই অতিরঞ্জিত করিয়া বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তাঁহার যত রকম আইন অস্ত্র ছিল, অমলের প্রতি তিনি সকলই প্রয়োগ করিলেন।

অমলের নামে পরোয়ানা বাহির হইল।

উপসংহার।

অমল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে তাহার পিতার দারুণ পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অধ্যাপক সার্দ্দা অমলকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। শঙ্কিত সন্ত্রস্ত ও লজ্জিত ভাবে অমল গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

পথে বিমলের সহিত অমলের সাক্ষাৎ ঘটিল। বিমল, স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিতে যাইতেছিল। বহুদিন পরে দুই বাল্য-বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটায় উভয়ের হৃদয়েই এক অননুভূত পূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বজ্রপাত হয়, সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অমলের হৃদয়েও এক বিষম শোক-শেল বিদ্ধ হইল।

গ্রামে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বিমলের মুখেই অমল শুনিতে পাইল,—পিতা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত; তাঁহাকে তীরস্থ করা হইয়াছে।

অমলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এ জীবনে সে বুঝি আর পিতার চরণ দর্শন করিতে পারিল না! অনুশোচনার তীব্র দংশনে অমল অধীর হইয়া পড়িল।

অমল ত্বরিত পদে উদ্ভ্রান্ত-ভাবে গঙ্গাতীর অভিমুখে অগ্রসর হইল।

জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়। আত্মীয়-স্বজন পার্শ্বে বসিয়া নাম শুনাইতেছেন। এমন সময় অমলকে সঙ্গে লইয়া বিমল সেই গঙ্গার তীরে উপনীত হইল।

জনৈক আত্মীয়-অন্তরঙ্গ স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তোমার অমল এয়েছে যে! একবার চেয়ে দেখ!"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ-শিখা জ্বলিয়া উঠিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, অমলের মুখপানে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। অমলেরও বক্ষঃস্থল অশ্রুপ্লাবিত হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—'সে গিয়া একবার পিতার চরণ স্পর্শ করে;—আর চরণ স্পর্শ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

কিন্তু সে অবসর আর মিলিল না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"আমার বড় ক্ষোভ রহিল, পুত্র বর্ত্তমানে পুত্রের জলগণ্ডুষ আমার ভাগ্যে মিলিল না।"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি উত্থিত হইল। আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে জলশায়ী করিলেন।

ফুরাইল!—সব ফুরাইল!

*　　*　　*　　*

ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টের পরোয়ানা আসিয়া অমলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

কেন ?

—— • ——

(প্রশ্ন। *)

(১)

সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসের সুখ? কোলে সোণার পুতলী বৎস, কৌশল্যার-মত শাশুড়ীর কন্যার-অধিক স্নেহ-যত্ন; তবুও মনের আগুন নেভে না! মা ত ছেলের দেখা পাইলেই বৌয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝান, বিনাইয়া বিনাইয়া আমার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেকে সচেষ্ট হন, আবার সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতেও ছাড়েন না! কিন্তু ইহাতে যে বড় সুফল দর্শে, তাহা

---

* মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯৮ সালের 'ভারতীতে' প্রশ্নমূলক এই কাহিনীটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের "অনুসন্ধান" পত্রে তাঁহার সেই "কেন" প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রশ্ন ও সেই প্রশ্নের উত্তর এস্থলে একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।

নহে; বরঞ্চ অনেক সময় বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এমনিতে তবু দিনান্তে একবার করিয়া প্রায় বাড়ী আসেন; কিন্তু, শ্বাশুড়ী বকাবকি করিলে দু'চার দিন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। স্বামী যে ভালবাসেন না, পোড়া প্রাণে তাহাও সয়; কিন্তু তাঁহার এ অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যেদিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মনে হয়, স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ। নেশা গো নেশা! সময়ে অহিফেন বা সুরা না পাইলে নেশাখোরের যে দুর্দ্দশা, ইহাও সেইরূপ এক প্রকার নেশা! সমস্ত বুঝি, তবু এ নেশা তাড়াইতে পারি না। কাজেই, শ্বাশুড়ীর শুভ-উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া, মনে মনে তাঁহার অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করি।

প্রায় দিন পনের হইল, এবার উনি ঘরে আসেন নাই। 'সেখানে' লোকের উপর লোক যায়; ফিরিয়া আসিয়া বলে,—'বাড়ী বন্ধ গো, বাবু বাগানে গেছেন।' শ্বাশুড়ী ভাবিয়া-চিন্তিয়া অস্থির; আর আমার আহার-নিদ্রা ত একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়! খোকার মুখের দিকে চাহিয়া, আর ভগবানকে প্রাণ-মনে ডাকিয়া, কোনরূপে দিনটা কাটিয়া যায় মাত্র! একদিন সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ-রাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নে দেখিলাম,—আকাশ ফাটিয়া চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল;

সেই জ্যোতির মধ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্টা এক দেবীরূপা রমণী আমাকে একটি জবাফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নে মাথায় পর, স্বামী ভালবাসিবে।" আমি ফুলটি ধরিলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু, কই সে দেবী, আর কোথায়ই বা সে ফুল!

তখনও ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই; আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া শাশুড়ীকে জাগাইয়া আমার স্বপ্ন তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"জবাটা পাইয়াছ?" আমি বলিলাম,—"না।" তিনি বলিলেন,—"বাছা, কালীঘাটে যাও; কালী তোমাকে ঐ অপরূপ বেশে দেখা দিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহার ফুল পরিয়া এস—মনঃক্লেশ দূর হইবে।"

(২)

আমাদের বাড়ী ভবানীপুর, কালীঘাট নিকটেই। আগেও অনেকবার কালীঘাটে আসিয়াছি, দেবীদর্শন করিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়াছি; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম—বলি-রক্ত-স্রোতের পার্শ্ব দিয়া লোলজিহ্ব, কৃপাণ-হস্তা, নৃমুণ্ডধারিণী ভীমরূপা কালীর সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন কেমন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্বপ্নের সেই করুণারূপিণী, প্রসন্না, হাস্যময়ী, অনুপমা, অপরূপা, প্রাণ-মোহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত ইঁহাকে এক ভাবিতে পারিলাম না। তাঁহাকে

দেখিয়া প্রাণ আশাযুক্ত সুশীতল হইয়া উঠিয়াছিল; ইঁহাকে দেখিয়া ভয়-শিহরিত, নিরাশ-কম্পিত হইয়া দ্বারদেশেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে উমি দাসী ছিল; ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল,—"ওমা, বৌমার আমাদের কি হ'লো গা!" সেখানকার একজন পূজারী, আমাদের চিনিতেন। তিনি তাড়াতাড়ি কালীর কোষাকুষি হইতে খানিকটা জল আমার মাথায় দিয়া, উমিকে বলিলেন,—"এখানে লোকজন আস্‌ছে, বৌমাকে ধরে ঐ গাছতলায় নিয়ে বসাও।" আমি উমিকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটু নির্জ্জন গাছতলায় বসিলাম। গাছতলায় আর একজন রমণী বসিয়াছিল; উমি তাহার সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসিল। বলিল,—"বৌ-ঠাকৃরুণকে নিয়ে আথান্তরে পড়েছিলুম! ভিরমী গো ভিরমী! হ্যাগা, তুমি কোথায় থাক গা?"

রমণী বলিল,—"আমি অনেক দূরে থাকি গো, আমায় চিন্‌বে না। তোমরা কোথা থেকে আস্‌চ?"

দাসী।—আমরা এই ভবানীপুরেরই লোক, প্রাণনাথ বাবুর নাম শুনে থাকৃবে কি? এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—

রমণী।—উনি তাঁর কে হন?

দাসী।—স্ত্রী গো স্ত্রী! তা বল্‌ব কি দুঃখের কথা,—ত্যজা হলেন কমলিনী, কুব্জা এখন পাটরাণী! একবার মুখপানে

চেয়ে দেখে-না-গো—দেখে-না, মনোদুঃখে শরীরটা পাত কর্‌ছে! একবার বেটীকে পাই তো দেখিয়ে দিই—ডাইনি বেটার একটু মায়া-দয়া নেই! এমন লক্ষ্মীর এই দশা কর্‌লি? তবু শুন্‌তে পাই নাকি, ভদ্রঘরের মেয়ে ছিল, পোড়াকপাল অমন—

আমি তথন ভাল হইয়া উঠিয়াছি; আমি বলিলাম,—"উর্মি, তা'কে গাল দিস্ কেন? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেন-নি; তা'র কি দোষ?"

ইহার পর অপরিচিতা নিকটে আসিয়া বলিল,—"সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন স্ত্রীকে স্বামী নেয় না!"

দাসী বলিল,—"শুধু নেয় না! দেখ-না, গায়ে একখানা গহনা পর্য্যন্ত রাখে-নি! এদিকে তো বাবু বাড়ী থাকেন না; কেবল যখন গহনার দরকার হয়, তখন রাতবাস কর্‌তে আসেন! আমরা এত করে বলি,—'বৌমা দিও না গো, স্বামী গেছে যাক, গহনাগুলো দিও না।' তা যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায়, তখন ওর কি আর বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে? মা সেদিন গহনার জন্য বাবুকে এমন তো গঞ্জনা দেয়-নি! বলে, ছাড়িয়ে আন্‌তেই হবে! সেই অবধি আর বাবুর দেখা নাই! আর দেখ-না, বৌমা ভেবে খুন হচ্ছে!"

আমি বলিলাম,—"কি বকিস্ উর্মি, চুপ কর্!"

রমণী বলিল,—"তা তো সত্যি কথা! আমরা হলে অমন

স্বামীর মুখ দেখি-নে! দিদি, তোমার ভাল হবে, এমন লোকের দুঃখ চিরকাল থাকে না।"

রমণীর নয়নে করুণা-জ্যোতিঃ বিভাসিত হইল। সে আমার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বিকম্পিত-স্বরে বলিল,—"এ পুণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য! দিদি, তোর দুঃখ আমাকে দে, মা-কালী যেন তোকে সুখী করেন।"

তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইল। আমার স্বপ্নের দেবীকে মনে পড়িল।

(৩)

সেইদিন দুপুর বেলা একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা আসিয়া হাঁকিল,—"ওগো মা-ঠাকরুণরা, এই গহনা নেও গো! বাবু আমার ঠাঁই বাঁধা রেখেছিল; টাকা দিয়ে বল্লে, বাড়ী দিয়ে এস। বুঝে সুঝে সব নেও।"

মা (শ্বাশুড়ী) তো আহ্লাদে নির্ব্বাক! উর্মি বলিল,—"মা-কালী বাবুর এই সুমতি দিয়েছেন! বৌমা এদিকে এস-গো—"

মা গহনা দেখিয়া লইতে লাগিলেন; আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কবে টাকা দিয়েছেন?" জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, কবে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে—আর একজন তাঁহাকে দেখিয়াছে শুনিলেও মনটা ঠাণ্ডা হয়!

বৃদ্ধা বলিল,—"এই আজকেরি—মরুক্‌গে—এই ক'দিন হ'লো দিয়েছে; তা' কাজে-কর্ম্মে আস্‌তে পারি-নি।"

মা বলিলেন,—"ছেলে কবে বাড়ী আস্‌বে, তা কি কিছু জান ?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল,—"তা বাছা, আমি কি করে জান্‌ব ? এখন তো গহনা পেলে, আমি চল্লু।" আমার ইচ্ছা করিতেছিল, বৃদ্ধাকে বসাইয়া ভাল করিয়া দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করিব! কিন্তু তাহা হইল না, বৃদ্ধা এমনই হঠাৎ চলিয়া গেল।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যা-বেলা স্বামীও বাড়ী আসিলেন। বাড়ীর সকলেরি মহানন্দ। মা তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া বলিলেন,—"বাছা, গহনা সব পেয়েছি। কিন্তু বিধাতা যে এতদিনে তোর সুমতি দিয়েছেন, তাহাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!"

স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি গহনা ?"

"কেন, বৌয়ের গহনা! যাকে বাঁধা দিয়েছিলি, সেই বুড়ী মাগী আজ দিয়ে গেল; বল্লে, তুই টাকা দিয়েছিস্‌।"

স্বামী একটুখানি দম লইয়া বলিলেন,—"ওঃ!"

আহারান্তে তিনি ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"গহনা দিয়ে গেছে; কই দেখি ?" আমি তাঁহাকে আনিয়া দিলাম।

তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ আজ পূর্ব্ব হইতেও বিষণ্ণ! গহনাগুলি দেখিবার পর আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন!

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—"তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে তো নেও-না!"

স্বামী কষ্টের স্বরে বলিলেন,—"না।" কিছু পরে তিনি অন্য দিনের মত চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে, খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, ঘুমাইয়া গেলাম। অনেক রাত্রি এমন গভীর নিদ্রা হয় নাই। সকাল বেলা খোকা উঠিয়া 'বা—বা' করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে; আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া মনে করিলাম,—একি, এখনো স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে চক্ষু-মর্দ্দন করিয়া আবার চাহিলাম, স্বপ্ন নহে—সত্যই স্বামী পার্শ্ব-দেশে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন! তাঁহার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহাবিপ্লব! আমি চমকিয়া বলিলাম,—"তুমি! কি হইয়াছে?" স্বামী কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলেন। খোকা 'বা—বা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন; তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি কাতর হইয়া বলিলাম,—"স্বামি, প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার।

কি হইয়াছে, আমাকে খুলিয়া বল; আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

স্বামী খোকাকে বিছানায় রাখিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছু চাহিবার নাই?"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল। আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই; পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেইদিন আমি জানিয়াছিলাম।

সেইদিন হইতে স্বামী একেবারে পরিবর্ত্তিত, স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি এখন গৃহবাসী। কিন্তু সহসা এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এ কৌতূহল আমার কখনো মিটিল না। স্বামী এ কথার উত্তর দিতে চাহেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কষ্টের স্বরে বলিয়াছিলেন,—"ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আমার এই অনুরোধটী রাখিও।" সেই অবধি তাঁহার কাছে আর এ কথা তুলি নাই; আপন মনেই সর্ব্বদা এই প্রশ্ন করি—'কেন?' কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও একটা স্থির মীমাংসাতে আসিতে পারি নাই; তাই আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিতে পার—কেন?"

কেন?

(উত্তর।)

(১)

আমরা ঘুমাইয়া আছি। এমন সময়, মানদা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল,—"আগুন—আগুন! জ্বলে ম'লাম—জ্বলে ম'লাম! জ্বলন্ত লৌহময় পুরুষ—বুক জ্বলে গেল—জ্বলে গেল!"

ঘুম-ঘোরে সে তখন এমনই চেঁচাইতেছে। সে চীৎকারে আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্তে, আশ্বাস দিয়া, আমি বলিয়া উঠিলাম,—"ভয় কি—ভয় কি—ভয় কি, মানদা! এই যে—এই আমি!"

মানদা চমকিয়া উঠিল,—"মা কালী! মা—মা! কই মা! তবে আমার কি হবে মা! তোর চরণে কি স্থান দিবি মা!"

এই বলিতে বলিতে, কি জানি কাহার চরণ ধরিতে গেল। কিন্তু, পরক্ষণেই, এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কঠোর অগ্নি-

দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে চাহিতে বলিল,—"তুমি!—তুমি! এখানেও তুমি! তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিলে! তুমিই আমার যম—তুমিই আমার নরক!"

এই বলিতে বলিতে ঘুম-ঘোরে আবার তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল; একটী পাশ ফিরিয়া, আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

আমি ভাবিলাম,—"অনেক রাত্তির জেগেছে; তাই গরমে অমন হয়ে থাক্‌বে!" আমার চক্ষু তখন ঘুমে ঢুলু-ঢুলু! কাজেই, আর কিছু ভাবিবার বা বলিবার অবসরই পাইলাম না। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইয়াছিল।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কিন্তু দেখিয়াছিলাম,—মানদা ঘরে নাই।

(২)

বাড়ীওয়ালীর নাম বামী। বামী এতদিন আমায় বড়ই আদর করিত। আগে আগে সে কালীঘাটে বা গঙ্গা-স্নানে যাইলে, আসিবার সময়, এটা-ওটা-সেটা কিছু-না-কিছু আমার জন্য আনিতই আনিত। কিন্তু আজ মানদার সঙ্গে সে যখন কালীঘাট হইতে কালী-দর্শন করিয়া আসে, তখন আর আমার সহিত কোনও কথাই কহে নাই। একবার একটুখানি সময় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দু'জনে কি একটু ফুস্-ফুস্ পরামর্শ করিয়া,

তাড়াতাড়ি অমনি প্রসাদের সরাখানা লইয়া, কি জানি কোথায়, সে তখন চলিয়া যায়; বলে,—"কালীঘাটে গিয়ে ও-পাড়ার দাসেদের বড়-গিন্নীর মুখে শুন্‌লাম, আমার বোন-পোর বড়ই ব্যায়রাম; তাই যাই, একবার দেখে আস্‌ি-গে, আর প্রসাদটাও দিয়ে আসি-গে।" মানদা তখন, শরীরটা অসুখ অসুখ করিতেছে বলিয়া, স্বামীর ঘরের ভিতর খিল-বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে। শুনিতে পাই, সে যেন যাতনায় কাঁদিতেছে! তাহাকে ডাকি, সে উত্তর দেয় না;—আমি ডাকিলে সে আরও কাঁদিয়া উঠে—আরও যন্ত্রণা অনুভব করে।

স্বামী ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে মানদার অসুখের কথা কিছু বলিতে যাইব, মনে করিতেছি; হঠাৎ সে বলিল,—"টাকা-কড়ি তুমি দেবে কি না বল! কুসি আজ হিসেব করে বল্‌লে,—গহনার চেয়ে সুদ ছাপিয়ে পড়েছে! তা'ছাড়া, যা' শুনে এলাম আজ, তা'তে এ ঋণ যে তুমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বে, তা তো আমার মনেই হয় না! যাই হোক্‌, বাপু, অনেক ভাঁড়াভাঁড়ি স'য়েছি; কিন্তু আজ টাকা চাই-ই!"

আমার যেন মাথা কাটিল! স্বামী আমায় আড়ালে যা বলে বলুক, কিন্তু মানদার সাম্‌নেই আজ এই অপমানের কথা! মানদা জানিত না যে, আমার পয়সা নাই—আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া তাহার কাছে বড়-মানুষী দেখাই;

কিন্তু আজ সে তো সকলই জানিল! স্বামী কেন আমায় আড়ালে ডেকে এ সব কথা বল্লে না!

"কথাগুলো সব আমি শুনি-নি; তবু যেটুকু আমি দেখ্‌লাম, তাতেই আমার কান্না এল! আহা, এমন ঘর-সংসার, এমন স্ত্রী—আরে মলো যা," কি বল্‌তে কি বল্‌ছি ছাই—যেমন করেই হ'ক, টাকাগুলি আজ আমায় কিন্তু দিতেই হ'চ্ছে! আজ আর আমি কোনই ওজোর শুন্‌বো-না।" এইরূপ বকিতে বকিতে, কতই রাগ-ভরে, সে আমার নিকট বারংবার টাকার তাগাদা করিতে লাগিল। আমি অধোমুখে, কান্না-কান্না চোখে, প্রমাদ গণিতে লাগিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মানদাও আমায় তিরস্কার করিতে লাগিল; বলিল,—"তবে তুমি আমায় আর ক'দিন রাখ্‌তে পার্‌বে? তোমার সবই দেখ্‌ছি, প্রতারণা! এই ক'দিনেই যখন তোমার এমন অবস্থা, তখন আমি আর কিসের ভরসা করি?" দেখিলাম—মানদা যেন আর সে মানদা নাই। সে উদ্ভ্রান্তভাবে কহিল,—"এক নিমেষ-মাত্র দেখেছি—আহা, আর কি সে দেবী এ পাপিনীকে দেখা দেবেন! বামা মা আমায় একদণ্ডখানি মন্দিরের পেছনের সেই মনসা-তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে, ঘরভাড়া-দক্ষিণে চুকিয়ে দিতে গিয়েছিলো—সেই একটুমাত্র সময়ে; সেই নিমেষ-মধ্যে আমি যে দেবীকে দেখিয়াছিলাম, আর কি কখনও

তাঁর দেখা পাব?" বলিতে বলিতে মানদা যেন আমায় তিরস্কার ছলে কহিল,—"তুমি গিয়েছ—তুমি মরেছ!—তোমার আর কিছুই সম্বল নেই যে, আমায় রাখ্‌তে পার! এখন সেই দেবী—সেই সতী-শিরোমণি পতিব্রতা মা-আমার—তিনিই যদি আমায় রক্ষা করেন! নিমেষ-মাত্র দেখা দিয়া—পাপিনী বলিয়া, ছলনা করিয়া—তিনি কোথায় গেলেন, জগত্তারিণি!"

মানদার মুখ-মণ্ডলে তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। আমি আর সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারিলাম না।

বামী বলিল,—"যদি এখনও ভাল চাও, যদি এখনও মানদাকে নিয়ে সুখী হতে চাও, তবে টাকাগুলি পত্রপাঠ চুকিয়ে দাও।"

বড়ই মর্ম্ম-যাতনায় আমি বলিলাম,—"গহনা-গুলো বেচেও তো টাকা নিতে পারেন! তা'র জন্য আর এত কেন?"

বামী একটু রুক্ষ-স্বরে বলিল,—"কা'র গহনা কা'কে বেচ্‌বো? সে পুণ্যবতীর এক বিন্দু চক্ষের জলে আমাদের নরকেও যে স্থান হবে না! তুমি টাকা নিয়েছ বাপু—টাকা দেও। আমি এত ঝঞ্ঝটে যেতে চাইনে।"

আমি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলাম। ভাবনার কূল-

কিনারা নাই। স্বামী এ সব এ বলে কি? টাকাই বা আমি পাব কোথায়? একটী পয়সা পা'বার উপায় থাক্‌তে, আমি তো ঘরে যাওয়া ছাড়ি-নি! স্ত্রীর হাতের নোয়া-গাছটি পর্য্যন্তও এনে যে আমি বাঁধা দিয়েছি! এখন আর স্বামীকে তবে কি করে টাকা দেব? মা? মা'তো আমার কিছুতেই দেবেন না! তাঁরা একেই তো আমার স্ত্রীকে দিন-রাত্রি বকেন,—"বৌমা, দিও না গো, স্বামী গেছে যাক, গহনা-গুলো দিও না।" তবে আমি কি করি? স্ত্রী কি কোনও রকম ক'রে দিতে পার্‌বে না? এইবার দিলে, আমি আর কখনও কিন্তু চাইবো না! এ দায়টা এবার উদ্ধার হ'লে এই নাকে-কাণে খত্‌...

এইরূপ ভাবিতেছি, বেলা প্রায় শেষ। স্বামী তখন আবার বলিল,—"ভাব্‌ছ আর কি ছাই? মায়ের হাতে তো ঢের টাকা আছে; গয়নাগুলো দেবে বলে, তাঁর কাছ থেকেই কিছু নিয়ে এস-না কেন? তার পর, গয়নাগুলো তাঁকে দিলেও তো হতে পারে! তবু তো তিনি সন্তুষ্ট থাকেন?"

আমি আর সে বাক্য-বাণ সহ্য করিতে পারিলাম না। মানদাও আমার প্রতি আর সহানুভূতি দেখাইল না। বরং আমায় যেন তখনকার'মত বিদায় করিতে পারিলেই সে বাঁচে! আমি বুঝিলাম,—তারও যেন মনোভাব—আমি মার কাছ থেকে টাকা এনে স্বামীকে চুকিয়ে দিই।

আমি টাকা আনিতে ভবানীপুরে চলিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম,—টাকা না আনিতে পারিলে আর এ মুখ দেখাইব না।

(৩)

ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। আজ কেন বাড়ীর এমন ভাব! আমি অবাক্! মা বলিলেন,—"বাছা, গহনা সব পেয়েছি।" কি গহনা? কে দিল?—কোথা থেকে এল? আমি তো ভাবিয়াই আকুল! মা আবার বলিলেন,—"যাকে বাঁধা দিয়েছিলি, সেই বুড়ি মাগি আজ দিয়ে গেল; বল্লে, তুই টাকা দিয়েছিস্।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। মা কি এ বিদ্রূপ করিতেছেন? অথবা সত্য সত্যই—না, না, তাও কি হ'তে পারে! আমি তো কই টাকা দিই-নি! যাই হোক, খানিক দম লইয়া বলিলাম,—"ওঃ!" যেন আমার টাকা দেওয়ার কথা মনে পড়িল, অথবা যেন আমি বুঝিতে পারিলাম, মা আমায় বিদ্রূপ করিতেছেন,—আমার মুখ দিয়া এমনই স্বর নির্গত হইল,—"ওঃ!" আমি কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিয়াছিলাম,—"ওঃ!" একবারও তখন ভাবি নাই যে, মা তাহা হইতে ভাবিবেন—অন্যরূপ।

অন্যদিন অপেক্ষা মা'র নিকট আজ আমার বড়ই আদর। মা বলিলেন,—"বিধাতা যে এতদিনেও তোর সুমতি দিয়েছেন,

তাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!

আহারান্তে, ঘরে বসিয়া, কতকটা বিদ্রূপ-স্বরে, আমার স্ত্রীকে বলিলাম,—"গহনা দিয়ে গেছে; কই দেখি?" স্ত্রী সত্য-সত্যই যে গহনা আনিয়া দিল! মা কি তবে সব জান্‌তে পেরেছেন? জান্‌তে পেরে, টাকা দিয়ে, তাই গহনাগুলো খালাস করে এনেছেন! বামীর গালা-গালি বকুনি সবই তিনি তবে শুনেছেন! কে তাঁকে এসে এ সব বল্লে? বামীর মনে এতটা ছিল—সে আমায় এমন ক'রে অপমানটা কর্‌লে? এ যদি আগে জান্‌তাম—

আমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া, আমার স্ত্রী বলিল,—"তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে তো নেও না!" এ কথায় আমি আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। গহনা খালাসের বিষয়—মা-ই যে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিয়াছেন, এ বিষয়ে—আমার কোনই সন্দেহ রহিল না। আমি কষ্টের স্বরে লজ্জিত হইয়া, অধোমুখে বলিলাম,—"না।"

মন বড়ই ব্যাকুল হইল। একজন কেবলই বলে,—'দেও দেও'; আর একজন কেবলই বলে,—'দরকার থাক তো নেও-না!' আমি কি পাষণ্ড! আমি কি ভ্রান্ত!

কিন্তু একটু পরেই সেই যে-কে-সে! নেশা গো নেশা! আমি

আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না। টাকা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন আর ভাবনা কি? বিশেষ বামীর প্রতি তখন বড়ই রাগ হইল। আর তাহার বাড়ীতে থাকিব না, সে আমায় এমন অপমান করে! এবার মানদাকে নিয়ে নূতন বাসা ক'রে থাক্‌বো। তাই তখনই চলিয়া গেলাম। স্ত্রী আমার মুখ-পানে তাকাইয়া রহিল—তাহার চোখে তখন অশ্রু পড়িবার উপক্রম হইল। আমি আর ফিরিয়াও চাহিলাম না।

(৪)

রাত্রি আন্দাজ দশটার সময়, আমি 'সেখানে' গিয়া পৌছিলাম। ডাকের উপর ডাক! কিন্তু কোনই সাড়া-শব্দ নাই। এরা সব গেল কোথা? রাগ-ভরে আমি ভাবিলাম,—এরা সব মলো নাকি? অনেকক্ষণ পরে গিস্‌-গিস্‌ করিতে করিতে আসিয়া, বামী দরজা খুলিল। বলিল,—"তোমাদের জ্বালায় জ্বলে মলেম যে! তিনি হ'লেন এক রকম, আর তুমি হলে বাছা আর এক রকম! তা' এতে কি আর বনি-বনাও হয়? তারও তো চোক-মুখ ফুটেছে? তা'কে আর ধরে রাখি, আমার সাধ্য কি? তুমি যাওয়ার পরই সেও তাই কোথায় চ'লে গিয়েছে!"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"বামা—বামা! একি বল্‌ছো? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে! মানদা—মানদা! কৈ সে? কোথা সে?"

বামী, হাত-মুখনাড়া দিয়া, আরও একটু রুক্ষ-স্বরে বলিল,—"আমি তবে মিছে কথা বল্‌ছি? বটে! বনের পাখী পিঁজরেয় পোরা কতক্ষণ থাক্‌তে পারে? শিক্‌লী কেটেছে কি পালিয়েছে! পালান প্নাথীর আশা করা আর বৃথা! এখন যাও বাছা—যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বামী আমার হাতে একখানি চিঠি প্রদান করিল। দেখিলাম, সে চিঠি মানদার হাতের লেখা। চিঠিখানি দিয়াই, বামী বলিল,—"যাও—যাও, আর আমায় বিরক্ত করো-না! এত রাত্রেও কি একটু ঘুমুতে পাবো না ছাই! তুমি যাও তো বাপু এখন। যদি কোনও কথা থাকে কাল আবার না হয় এসো!"

আমি বলিলাম,—"মানদা—মানদা কই?"

"মানদা মরিয়াছে!"—বামী বড়ই রুক্ষস্বরে বলিল।

আমার কান্না আসিল। তবুও একবার-মাত্র সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি ঘরে মানদা থাকে! কিন্তু সে তো নাই! বামীর কঠোর বাক্য আর সহিতে পারিলাম না। সেই পত্রখানি হাতে করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে দরজার বাহির হইলাম। বামী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পত্রখানি কি? বড়ই ঔৎসুক্য হইল। রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো। সেখানে দাঁড়াইয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিলাম।

"তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। না বুঝিয়া এতদিন যে পাপ করিয়া আসিয়াছি, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় পাইব—তাহারই অন্বেষণে চলিলাম। আমার যাহা হইবার, তাহা তো হইয়াছে! কিন্তু তুমি এখনও সাবধান! এতদিন হীরাকে ফেলিয়া তুচ্ছ কাচে ভুলিয়া ছিলে; পবিত্র গঙ্গাজল ফেলিয়া, চণ্ডালস্পৃষ্ট তুচ্ছ কূপোদক পান করিতেছিলে! কিন্তু সাবধান—এখনও সাবধান! তোমার স্ত্রী—আহা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী—তোমা বই আর তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে ফেলিয়া, আমাকে লইয়া—এ কি তোমার, এ কি কু-প্রবৃত্তি! সে সতী-সাধ্বীর এক বিন্দু অশ্রু-জলে এতদিন আমি ভস্মীভূত হই নাই কেন? তা হ'লে তো আমায় এত অনুতাপ সহিতে হইত না?"

উহু-হু, কি জ্বালা—কি যন্ত্রণা! আর সহিতে পারি না। তাই চলিলাম—কোথায় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, একবার দেখিব! তুমি এখনও—এখনও সাবধান! যদি বাঁচিতে চাও, তবে এখনও—এখনও এ পথ পরিত্যাগ কর। আমার আশা আর করিও না। এ জগতে আমায় আর মিলিবে না। যাও তুমি, গৃহে যাও—সেই দেবী-প্রতিমার নিকট পরামর্শ লও। যদি একবিন্দুও আমায় ভালবাস, তবে একবারও তাঁহার নিকট আমার উদ্ধারের প্রার্থনা করিও। সে কোপানলে জ্বলিলাম—পুড়িলাম—মরিলাম!

"আমাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য তুমি যে গহনাগুলি বন্ধক

দিয়াছিলে, সেগুলি আমারই নিকট ছিল। সতী-সাধ্বীর সে অলঙ্কারগুলি আমার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইতেছিল। সেগুলি আজ স্বামীকে দিয়া তোমার মাতৃদেবীর নিকট ফেরত দিয়াছি। পাছে তিনি গ্রহণে আপত্তি করেন, এই জন্ম তোমারই নামের অছিলা করিয়া পাঠাইয়াছি।"

(৫)

হতাশে, বিষাদে, বিস্ময়ে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। এখন কোথায় যাই ? যেন আপনার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে, তখন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সংজ্ঞা নাই—জ্ঞান নাই যে, রাত্রি তখন শেষ হইয়াছে।

আমার ঘরে প্রবেশ করিতেই বুঝিলাম—তখন সকাল-বেলা ! খোকা উঠিয়া 'বা—বা' করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে ; আমার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহাবিপ্লব ! স্ত্রী যেন স্বপ্ন-ঘোরে চমকিয়া উঠিল,—"তুমি ! কি হইয়াছে ?" আমি কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলাম। খোকা 'বা—বা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাহাকে তুলিয়া বুকে লইলাম ; আমার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। স্ত্রী আবার কাতর-স্বরে বলিল,—"স্বামি, প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার ! কি হইয়াছে, আমাকে খুলিয়া বল ; আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় আমার প্রাণে যে তখন কি গভীর আন্দোলন

উপস্থিত হইল, তাহা আর বলিবার নহে। আমি তখন, খোকাকে বিছানায় রাখিয়া, আমার স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, বলিলাম,—"তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছুই চাহিবার নাই!"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল। আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই; পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই দিনই জানিয়াছিলাম।

সেদিন হইতেই আমি একেবারে পরিবর্ত্তিত—স্ত্রী-পুত্র লইয়া আমি এখন গৃহবাসী।

সময় সময় আমার স্ত্রী আমার এ পরিবর্ত্তনের কারণ জানিতে চাহিত বটে; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু কহিতে পারিতাম না। তবে বেশ বুঝিয়াছিলাম,—কি কারণে সে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম,—সতী-রমণীর একনিষ্ঠা, ঐকান্তিকী পতি-ভক্তিই আমাকে সে নরকের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম—"সতীত্বের মাহাত্ম্যে সে আসাধ্য সাধন হইয়াছিল।"

সম্পূর্ণ।